বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি।

প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

গুপ্তপ্রেস

২৪, মীর্জ্জাফর্ণ লেন, কলিকাতা।

১২৮২

বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি।

গাম্ভীর্য্যন্দধতী সতী বসুমতী রক্ষাং সমাতন্বতী
দানৈঃ কল্পলতামধঃকৃতবতী শুভ্রংযশোবিভ্রতী।
শ্রীলক্ষ্মীশ্বরসিংহভূপজননী বৈদেহদেশেশ্বরী
শ্রেয়ঃশ্রীসহিতা মহেশ্বরলতা দেবী চিরং রাজতে ॥ ১
তস্যাঃ সেবনতৎপরেণ বিভবং সংপ্রাপ্য পূর্ণংততঃ
তূর্ণং শ্রীবসুচন্দ্রশেখরইতিখ্যাতেন নত্বা হরিম্।
সম্যগ্বীক্ষ্য মতানি দর্শনকৃতাং বিজ্ঞায় তত্ত্বং পুনঃ
গ্রন্থোয়ং পরমার্থবোধফলকোনির্ম্মায় সম্মুদ্রিতঃ ॥ ২

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ভূমিকা।

—

এই সকল ভগবৎপ্রসঙ্গ নানা সময়ে দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। এইক্ষণ বিনীতভাবে এ সমস্ত কুসুমাঞ্জলি-স্বরূপে সাধুসমাজে উপহার প্রদান করিতেছি। প্রার্থনা করি তাঁহারা ভ্রম দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

নির্ঘণ্ট

মিশ্র বক্তৃতা।

সাম্বৎসরিক উৎসব।

গীতা শাস্ত্র।

নমস্কার ও স্তোত্র।

মিশ্র বক্তৃতা।

বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি।

সংখ্যা ১

দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ, ১৪ ফাল্গুণ ১৭৯৩ শক রবিবার।

ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রথম প্রকরণ।

ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্মস্বরূপ।

১। পরমেশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তিনি একই, দুইবা বহু নহেন। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার স্বজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। তিনি সত্তাতে এক অদ্বিতীয়, স্বরূপেতে এক অদ্বিতীয়। তাঁহার সত্তা হইতে তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন-গুণ-বিশিষ্ট নহে। অর্থাৎ তাঁহার সত্তাও যাহা, তাঁহার স্বরূপও তাহা। আমাদের শরীর আর আত্মার যোগে যেমন আমারদের সত্তা, ঈশ্বরের সত্তাতে তাদৃশ দেহের যোগ নাই। আমারদের শরীরের স্বরূপ ভৌতিক এবং আত্মার স্বরূপ আধ্যাত্মিক—তাঁহার মধ্যে তাদৃশ দ্বৈতভাব নাই। তাঁহার সত্তা, স্বরূপ ও আত্মা এই তিনই এক অদ্বিতীয়। তিনি পরমাত্মা।

২। যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত্তা উভয়ে এক অভিন্ন তথাপি আমরা তাঁহার সত্তা যত অনুভব করিতে পারি তাঁহার

স্বরূপ তত বুঝিতে পারি না। অর্থাৎ "তিনি আছেন" ইহা যত জানি, "তিনি কি প্রকার" তাহা তত জানি না। ইন্দ্রধনুর দৃশ্য যত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার স্বরূপ, তাহার তত্ত্ব তত পাওয়া যায় না। এই বিভিন্নতার কারণ কেবল আমারদেরই অপূর্ণতা। আমরা অপূর্ণ বলিয়াই আমরা যাহার অবয়ব দেখি, পূর্ণভাবে তাহার তত্ত্ব পাই না এবং যাহার অস্তিত্ব অনুভব করি তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারি না। পর্ব্বত দেখিতেছি, কিন্তু তাহার স্বরূপের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পাই না, মানবকে দেখিতেছি, তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিনা, "দেশ আছে" জানিতেছি কিন্তু তাহা অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিতে অক্ষম, কালের অস্তিত্ব বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু অনাদি অনন্ত কালকে মনেতে ধারণ করিতে অপারক। যাহা দেখিতেছি, যাহা অনুভব করিতেছি, তাহার কেবল বাহ্য সত্তা, সাধারণ অস্তিত্ব ও প্রকাশ্য আবির্ভাব দেখিতেছি বা মনেতে অনুভব করিতেছি; কিন্তু তাহার গূঢ়-স্বরূপ, সংবৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে পাই না। তবে, সকলের শ্রেষ্ঠ—সকলের স্রষ্টা মহেশ্বরের মহামহিম ও নিগূঢ়তম স্বরূপের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাইব? "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"। যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কিপ্রকারে উপলব্ধ হইবেন?

৩। কিন্তু কোন বস্তুর স্বরূপের বা তত্ত্বের সাধারণ আবির্ভাব ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব বা সত্তা জানা যায়না। কেন না, ইন্দ্রধনু স্বকীয় যে সমুদয় বিচিত্রতা দ্বারা নরের মনোহরণ করে, সে বিচিত্রতার সাধারণ প্রদর্শন ব্যতীত যেমন সে ইন্দ্রধনু প্রত্যক্ষ হইত না, সেইরূপ জগৎকর্ত্তার যে বিচিত্র

স্বরূপের ধর্ম্মে আমারদের হৃদয় ও মনকে মোহিত করে তাঁহার সে স্বরূপের সাধারণ আবির্ভাব ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না। অতএব তাঁহার স্বরূপের সেই সাধারণ আবির্ভাবই তাহা যাহাকে আমরা তাঁহার অস্তিত্ব বলি। আমরা সাধারণ জ্ঞানে ঐ অস্তিত্ব অনুভব করি; কিন্তু বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি না। ফলে যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই—অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করিবার ক্ষমতাস্বরূপ সাধারণ জ্ঞান যাঁহার নিদ্রিত তিনি বিশেষ জ্ঞান কোথা হইতে পাইবেন? তাঁহার অস্তিত্বের জ্ঞানই আমারদিগকে ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বরূপের জ্ঞানে লইয়া যায়—জানিতে জানিতে যখন আমরা বুঝিতে পারি তাঁহাকে আর জানা যায় না, তখনই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি—তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে করিতে যখন আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিনা, তখনই আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি—সেই আনন্দ উপভোগে যখন সীমা থাকেনা—যখন তাহার মধ্যে—সেই গভীর সুধার্ণবের মধ্যে, আমরা বাক্য আর মনকে ভুলিয়া গিয়া নিমগ্ন থাকি, তখনই আমরা সেই ত্রিভুবন-বিজয়ী পরম পদ লাভ করিতে পারি।

৪। মানব যখন সাধারণ-জ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন তখন অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধি আসিয়া সেই অস্তিত্বভেদ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে যায়। ব্রহ্মস্বরূপ অবিভাজ্য এবং রূঢ়, তথাপি ঐ বুদ্ধি একবার চেষ্টা করিয়া দেখে তাঁহাকে বিভাগ করিয়া বুঝা যায় কি না। মানবের স্বভাব এই যে, যে কোন তত্ত্ব তিনি সাধারণ জ্ঞানে একেবারে পূর্ণভাবে না পান, তিনি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ

করেন এবং এক এক অংশের তত্ত্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রহণ করেন। মানব, যে সাধারণ জ্ঞানে অখণ্ডরূপে সাধারণ ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বলিত সম্পূর্ণ ব্রহ্মসত্তার অনুভব করেন সেই সাধারণ জ্ঞানই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বোধের ও ঐরূপ বুদ্ধির কার্য্যের মূলভূমি—সে জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণ। কিন্তু বুদ্ধির অধিকারে মনুষ্য নিশ্চিন্ত থাকিবার নহেন। বুদ্ধি নিয়ত শ্রুতি-পাঠ, দর্শন-পাঠ, চিন্তা ও যুক্তি করিয়া অখণ্ড-রস-স্বরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপকে খণ্ড খণ্ড করে এবং একে একে অংশ-জ্ঞান প্রদান দ্বারা সাধারণ জ্ঞানকে প্রশস্ত, উদার ও সুধাময় করিতে থাকে; বস্তুতঃ বুদ্ধি পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপকে কখনই বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না। তাহার কার্য্যের অন্ত নাই, চাঞ্চল্যের পরিহার নাই। সে যদি সাধারণ জ্ঞানের কোষাগারে প্রজার ন্যায় কর-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদান না করে তবে সে ব্রহ্মস্বরূপ অন্বেষণ করিতে গিয়া আপনি ব্রহ্মসত্তা হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং একেবারে কুতর্ক ও নাস্তীতি-বাদ-সাগরে পতিত হইয়া যায়। আর যদি সেই সাধারণ জ্ঞানকে রাজার ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার উপার্জ্জিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে করস্বরূপে সেই রাজার কোষাগারে প্রেরণ করে তবে তাহা কর্ত্তৃক ঈশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞান বিচলিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকাধিক স্বরূপ-জ্ঞানের সহযোগে সমুজ্জ্বলিত হইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থাপন্ন বুদ্ধিই শুভ-বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। শুভ-বুদ্ধি যখন দেখে যে, সে যতই আহরণ করে সে সকলি গিয়া সাধারণ জ্ঞানের প্রত্যয়ে সংযুক্ত হয়, তখন সে স্বয়ং সকল অন্বেষণের অন্তে গিয়া আপনিও সেই প্রত্যয়ে পরিণত হইয়া যায় এবং আপনার নাম ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করে। সেই অবস্থায় সাধারণ জ্ঞানও যখন দেখে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা

সে ব্রহ্মস্বরূপকে অধিক পরিমাণে উপার্জ্জন করত তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছে তখন সে আপনার "সাধারণ জ্ঞান" এই নামটি ত্যাগপূর্ব্বক "ব্রহ্মজ্ঞান" নাম গ্রহণ করে। সাধারণ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের সহিত শুভ-বুদ্ধির নিরূপিত ব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গম-স্থানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান।

৫। অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব আপনার স্থবিধার জন্য এক অখণ্ড শূন্যের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঊর্দ্ধ, অধঃ প্রভৃতি দিগ্‌ভাগ করিয়াছেন। অখণ্ড কালের মধ্যেও ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কাল নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক দেশ ও কাল উভয়েই অখণ্ড এবং একমাত্র রূঢ় পদার্থ। শূন্যের উত্তর দক্ষিণাদি, কালের ভূত ভবিষ্যদাদি উহারদের স্ব স্ব প্রকৃত বিভাগ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে দিকের উত্তর দক্ষিণাদি এবং কালের ভূতাদি বিভাগ নাই। ও সমস্ত আমারদের স্থবিধা-জনক আপেক্ষিক ভাব মাত্র। সেই রূপ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ অনন্ত, অখণ্ড এবং একমাত্র রূঢ় পদার্থ। পার্থিব পদার্থের ন্যায় তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বিভাগ করা যায় না। তথাপি মানবের বুঝিবার স্থবিধার জন্য বুদ্ধি তাঁহাকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি বিভাগে ব্রহ্মস্বরূপকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। যদিও বুদ্ধি তাঁহাকে ঐ রূপে বিভাগ করে কিন্তু ঐ সব ভাগ আত্মপ্রত্যয়ে অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান-কোষে প্রবেশ মাত্রে ঈশ্বর-সত্তার বিশ্বাসের সহিত এক হইয়া যায়—তাহাতে পূর্ব্ব প্রত্যয়িত ব্রহ্মসত্তা উত্তরোত্তর ব্রহ্ম-স্বরূপের বিশেষ জ্ঞান-লাভে পুষ্ট হইয়া ইন্ধন-প্রাপ্ত যজ্ঞাগ্নির ন্যায় অধিক জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি যদি অল্পে অল্পে ব্রহ্মজ্ঞান

আহরণ করিয়া ব্রহ্মসত্তার সহজ জ্ঞানকে পোষণ না করিত তবে সে সহজ জ্ঞান বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকিত। মানবের সাধারণ জ্ঞানে অর্থাৎ সহজ জ্ঞানে ব্রহ্মসত্তার যে মূল পরিচয় আছে তাহা এইরূপে ক্রমে ক্রমে সবল হয়, নতুবা সেই ভূমা মহেশ্বরকে একদিনে কে গ্রাস করিতে পারে? ব্রহ্মসত্তার বিশ্বাসে অটল থাকাই নরের প্রথম প্রতিষ্ঠা—পশ্চাৎ শুভ-বুদ্ধি-যোগে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই দুই দিকে দুই দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বুদ্ধি দ্বারা যতই কার্য্য করুন কিছুতেই দোষ নাই। যত ক্ষণ মনুষ্য কেবল উত্থানের দিকে দৃষ্টি রাখেন তত ক্ষণ দোষ নাই, কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের কোন খণ্ড অংশকে পূর্ণব্রহ্মরূপে গ্রহণ করত সেই স্থলেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন তখনই দোষ। যখন অন্বেষণ করিতে করিতে এমত বোধ হয় যে, তাঁহাকে পাইলাম না—অতএব তিনি নাই, তখনই নাস্তিকতা; আর যখন অন্বেষণে না পাইয়া স্থির হয় তিনি অসীম ও বাক্য মনের অগোচর তখনই ব্রহ্ম-লাভ। অতঃপর যখন অন্বেষণের মধ্য-পথে তাঁহার স্বরূপকে বিভাগ করিতে ত্রুটি করা যায় না তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝা যায় না। এই অবস্থায় মানব বাহ্যে বা মানসে পৌত্তলিক থাকিতে পারেন—সাকার-বাদী বা ব্রাহ্ম নামও লইতে পারেন, তাহার কিছুতেই দোষ নাই—কেবল অহঙ্কারমূলক উপাধিই দোষের হেতু। বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম-পথে এই অবস্থার লোকই অনেক। নামে যিনি যাহা হউন, হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিন আর ব্রাহ্ম বলিয়াই পরিচয় দিন, উন্নতি সম্বন্ধে উভয়ই প্রায় সমকক্ষ। বুদ্ধি বা কল্পনা দ্বারা মানব ব্রহ্মকে যতই খণ্ড খণ্ড করুন, তাঁহার ভাবকে যতই

খর্ব্ব করুন সে সকল যদিও সুবিধার নিমিত্ত—যদিও ব্রহ্ম-লাভের সোপান স্বরূপ—যদিও সহজ জ্ঞানের ক্রম-পোষক, কিন্তু সে সমুদয়ই শূন্যের ও কালের নানা অংশের ন্যায় মিথ্যা উপাধিমাত্র—কেন না, ব্রহ্মস্বরূপ একেবারে অবিভাজ্য।

৬। মানবাত্মা ইহকাল পরকালে যে কণামাত্র ব্রহ্ম-তত্ত্ব লাভ করত বলবান্ হইবে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম-তত্ত্ব তদপেক্ষা অপরিমাণে অধিক। সেই কণামাত্র ব্রহ্মজ্ঞানও মানব একেবারে গ্রহণ করিতে পারেন না, কেবল একে একে বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। তাহাতেই তাঁহার আত্মা ব্রহ্মজ্ঞানে গঠিত হইতে থাকে।

৭। মানবের নিকটে ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, অমৃত, শান্ত, মঙ্গল প্রভৃতি বহুগুণ দ্বারা পরিচিত হয়েন—এ সকলই আপেক্ষিক, এ সকলই মানব কর্ত্তৃক বিভক্ত ও উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার স্বরূপকে ভাগ করা যায় না। মানব তাঁহার যতই গুণ কল্পনা করুন সে সমস্তই তাঁহার অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপ। যখন বিশেষ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জিত হয় তখন আর সে রূপ ভিন্ন ভাব থাকে না। ব্রহ্ম-স্বরূপের যে সকল গুণগত ভিন্ন ভাব আমরা গ্রহণ করি তাহা শ্রুতি ও আমারদের বুদ্ধি উভয়ের সম্মত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানা-ভিষিক্ত আত্মার নিকটে তাহা গ্রাহ্য নহে—সেখানে সে সমুদয়ই অখণ্ড-রস-স্বরূপে উপনীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান-যুক্ত আত্মা যেন বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা, তর্ক, বিচার প্রভৃতির মহাসম্মিলন-ক্ষেত্র। যেমন নদী সকল চতুর্দ্দিকের অচল-সমূহ হইতে অবত-রণ করিয়া আপন আপন রূপ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাগরে সঙ্গমিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা প্রভৃতি তাহারদের

নিরূপিত ঈশ্বরীয় খণ্ড-জ্ঞান-সম্মিলিত একাকারে ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ মহাসাগরে লয় প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ততদূর প্রবাহিত না হয় তখনই সঙ্কীর্ণতা। বুদ্ধি, যুক্তি ও কল্পনা দ্বারা নিরূপিত ঈশ্বরের গুণগত ভিন্ন ভাবের এক একটি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে যখন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করি অথবা সেই ভিন্ন ভিন্ন গুণ সমূহ দ্বারা যখন আমরা ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ করি তখনই আংশিকতা বা পৌত্তলিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। যদিও আংশিকতা বা পৌত্তলিকতা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে কিন্তু তাহার দ্বারা ঈশ্বরের অখণ্ডস্বরূপ লাভ হয় না। ফলতঃ বুদ্ধি শুভ না হইলে, যুক্তি মীমাংসাকে আশ্রয় না করিলে, চিন্তা বৈরাগ্য অবলম্বন না করিলে, বিচার বিবেকের হস্ত না ধরিলে, কোন মতেই তাহারদের দ্বারা বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তবে সহজ জ্ঞানের উৎস হইতে বুদ্ধি, যুক্তি বা বিবেচনা ব্যতীতও ব্রহ্মসত্তার সাধারণ জ্ঞানোচ্ছ্বাস যে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র, তাহা হইবেই হইবে। তাহা না হইলে বরং বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রত্যয়ের অভাবে জগতে কোন প্রকার উপাসনা তিষ্ঠিতে পারে না এবং সাধারণ জ্ঞান অভাবে বিশেষ জ্ঞানও হয় না।

ইতি প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

পরমেশ্বর দেশ কালে বদ্ধ নহেন।

৮। পরমেশ্বর অল্প স্থান বা অল্প কাল লইয়া অদ্বিতীয় নহেন। কাল বা দেশ সম্বন্ধে তিনি অল্প অদ্বিতীয় নহেন কিন্তু অনন্ত অদ্বিতীয়। আমারদের সম্বন্ধেই কাল আর দেশের পরাক্রম, তাঁহার সম্বন্ধে তাহা নাই। তাঁহার শক্তি ও কার্য্যের বিস্তারই যেন আমারদের পক্ষে দেশ হইয়া রহিয়াছে, আর সেই শক্তি ও কার্য্যের গভীরতাই যেন আমারদের নিকটে কাল বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা অপূর্ণ—তাঁহার কীর্ত্তির সর্ব্ব স্থানে আমরা একেবারে বিদ্যমান থাকিতে পারি না—সুতরাং ক্রমে ক্রমে আমরা সেই অনন্ত ক্রিয়ার মধ্যে পদবিক্ষেপ করিতেছি তাহাতে সেই ক্রমের দ্রুতত্ব অনুসারে কালের পরাক্রম সংক্ষিপ্ত হইয়া দেশ অতিক্রান্ত হইতেছে। আমরা অপূর্ণ—তাঁহার মহিমার দুরবগাহ্য গাম্ভীর্য্য বুঝিয়া উঠিতে, সম্ভোগ করিতে, ধারণ করিতে আমারদের বিলম্ব হয়; তাঁহার অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক নিয়ম, সাংসারিক ব্যবস্থা, এবং ধর্ম্ম-নীতিকে আয়ত্ত করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে আমারদের দেহ, মন একেবারে সক্ষম হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সব কার্য্যে শক্তি পরিচালনা করে, এবং সেই বিলম্ব ও ক্রমই আমারদের পক্ষে কাল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে দেশ কালের তাদৃশ পরাক্রম নাই। তাঁহার এক স্থান হইতে

অন্য স্থানে যাইতে হয় না—যেহেতু তিনি একেবারে সর্ব্বত্রে সমভাবে বর্ত্তমান। "সর্ব্বত্র" শব্দের অপরিসীম ভাব আমরা যতদূর পরিগ্রহ করিতে পারি, তাঁহার বর্ত্তমানতা তাহা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। অনন্তের ভাব আমরা ধারণ করিতে পারি না। তাঁহার প্রসাদে যাঁহার আত্মা যত উন্নত তিনি অনন্তের তত পরিচয় পান। দীন, হীন, ক্ষুদ্র, মানব যতই কেন সেই অনন্ত ভাবকে খর্ব্ব করিয়া দেখুন না তাহাতে পরমাত্মার অনন্তত্ব ও নিত্যতার বিঘ্ন-সম্ভাবনা নাই। অতি উন্নত ব্রহ্মবাদীরা যতই কেন অনন্ত-ভাব-গ্রহণে সমর্থ হউন না, ব্রহ্মের স্বকীয় ধ্রুব অনন্তত্ব ও নিত্যতা তাহার অপেক্ষা অনন্ত-ভাবেই অধিক থাকিবেক। নিহার-বিন্দুর সহিত সাগরের তুলনা, বালুকণার সহিত ধরণীর তুলনা, খদ্যোতের সহিত সূর্য্যের তুলনা যত অসম্ভব হয়, পরমেশ্বরের অনন্ত-বর্ত্তমানতার সহিত মনুষ্য-ধৃত "সর্ব্বত্র," "অনন্ত," "অসীম" প্রভৃতি ভাবের তুলনা তাহা অপেক্ষাও অধিক অসম্ভব। সমগ্র দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে যতই কেন অনন্ত হউক না তাহা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নাহি, কিন্তু তাঁহার শাসনে থাকিয়া আমারদিগের ব্রহ্ম-লাভের পন্থা ও সোপানস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেই দুর্ব্বোধ-গম্য সীমাতীত মহাপন্থা—সেই দিব্যধামের সোপান-পরম্পরা তাঁহার সম্বন্ধে "অত্র" স্বরূপ; কিন্তু আমারদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সেই ব্যবধান অবলম্বন করিয়া অসংখ্য অসংখ্য সৌরজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, এমত সকল মহামহা সূর্য্য উপরিস্থ গগণ-সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীর ন্যায় ভাসিতেছে, যাহারদের এক একটির গর্ভ-ক্ষেত্র খনন করিলে তন্মধ্যে এই ধরণার মত লক্ষ লক্ষ ধরণী প্রবেশ করিতে পারে। কোথায়

আমরা পতিত রহিয়াছি—আর কোথা হইতে সেই পতিত-পাবন আমারদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন!

৯। সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, অদ্বিতীয় দেবের পক্ষে অনাদি অনন্ত-দেশ যেমত "অত্র" স্বরূপ, সেইরূপ অনাদি অনন্তকাল তাহার অদ্য, কল্য, বার, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর, যুগ, মহাযুগ, কল্প, মহাকল্প, আর ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বলিত তাঁহার পক্ষে "বর্ত্তমান দর্পণ" স্বরূপ। সেই দেবাদিদেবের সিংহাসন হইতে আমরা যত দূরে দীন হীন ভাবে পতিত রহিয়াছি কাল সেই ব্যবধানের মধ্যে আপনার অনন্তকায়া বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে এবং আমারদিগকে ক্রমে ক্রমে সেই দুর্ল্লভ ব্রহ্ম-নিকেতনে লইয়া যাইতেছে। সেই ব্রহ্ম-পুর হইতে সৃষ্টি, পালন, সংহার এবং আমারদের ফল কার্য্য, নিয়তি কালের যোগে আসিতেছে, কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ং কালের বশতাপন্ন নহেন সুতরাং তাঁহার সম্মুখে আমারদের ঘটনা-চক্র বর্ত্তমানের ন্যায় রহিয়াছে। ফলতঃ যাঁহার সম্বন্ধে কালের পরাক্রম নাই—কেবলই বর্ত্তমান, তিনিই প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান জীবন্ত দেবতা, তিনিই সত্যভাবে জাগ্রত জ্বলন্ত সত্তা। তিনি যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, যেমন জাগ্রত, যেমন জ্বলন্ত আমরা তেমন নহি। আমারদের ভাব প্রায় বিপরীত। তাঁহার পক্ষে কালের পরাক্রম নাই, কেবলই বর্ত্তমান, কিন্তু আমারদের পক্ষে বর্ত্তমান নাই, কেবলই কালের পরাক্রম। বর্ত্তমানকে আমরা ধারণ করিতে পারি না, কাল আসিতেছে আর যাইতেছে; বর্ত্তমান এতই সূক্ষ্ম যে আমারদের ধারণাকে তাহা স্পর্শও করে না। আমরা ভূতকালের পক্ষে, গতকল্যের পক্ষে আর নাই, কেবল স্মরণ মাত্র, কর্ম্মসূত্র পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছি; এবং ভবিষ্যতের পক্ষে—

আগামী কল্যের পক্ষে জীবন্তও হই নাই কেবল আশামাত্র প্রার্থনাসূত্র ধরিয়া উঠিতেছি। উভয় ভাবেই আমরা মৃতবৎ রহিয়াছি; ভূতের কৃতকর্ম্ম ও ভাবীর ভরসামাত্র আমারদের আত্মার প্রকৃতিকে সংগঠিত করিতেছে। কাল কেবল আমারদের সোপানমাত্র—তাহা দ্রুতভাবে যেমন বিগত হইতেছে অমনি একটি অকার্য্যকর উপাধি মাত্র রাখিয়া যাইতেছে—আর যখন আগত হয় নাই তখনও সেই উপাধি দ্বারা আমারদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। সে জানিয়া শুনিয়া আমারদের মঙ্গল বা অমঙ্গল করে না; কেবল আমারদেরই কৃতকর্ম্ম এবং কামনা আমারদিগকে অধিকার করিতেছে। বস্তুতঃ কালের উপরি আমারদের নির্ভর নহে, কিন্তু কর্ম্ম ও কামনার উপরিই নির্ভর। কর্ম্ম যদি উৎকৃষ্টরূপে—সাধুভাবে কৃত হয় তবে এই বলিতে হইবে যে ভূত কালকে আমরা বৃথা যাইতে দিই নাই। সেই সুকৃতি আত্মাকে পুষ্ট করিয়া ভাবীর নিমিত্তে আমারদের সাধু কামনা রচনা করে এবং সেই সাধু কামনা আবার সাধু কর্ম্মের প্রসূতি হয়। কিন্তু যদিও আমারদের বর্ত্তমান কামনা বর্ত্তমান কালকে ধারণ করিতে পারে না, ভবিষ্যতের প্রতিও নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ভর করিতে পারে না—কেন না আমরা আগামী কালের পক্ষে মৃতবৎ রহিয়াছি—অথবা ইহাই বলা যাউক যে আগামী কাল এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই—তথাপি আমাদের বর্ত্তমান কামনার নির্ভর-স্থলের অভাব নাই। যিনি অনন্ত-বর্ত্তমান—কাল যাঁহাকে অধিকার করে না তিনিই আমারদের কামনার একমাত্র নির্ভর-স্থল। কামনা তাঁহাকে আশ্রয় করিলে সৎফল প্রসব করে—যদি ভূতের দুষ্কৃতি থাকে তাহাও সেই সৎফল জন্য প্রক্ষালিত হয়। দুষ্কৃতি জন্য যদি

আত্মার প্রকৃতি বিরূপ হইয়া থাকে তাহাও ঐ পুণ্যে দেবরূপ ধারণ করে।

১০। ফলতঃ আমারদের সম্বন্ধে দেশ কালের যে পরাক্রম তাহা পরমেশ্বর জানিতেছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেছেন যে, আমরা ক্রমে ভিন্ন একেবারে তাঁহার সৃষ্টির জ্ঞান ও তাঁহার শক্তির জ্ঞান পাইতে পারি না এবং ধীরে ধীরে ভিন্ন একেবারে আমারদের সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি না। তিনি তাঁহার স্বকীয় মহত্ত্ব এবং আমারদের ক্ষুদ্রত্ব একেবারেই জানিতেছেন। তিনি আমারদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া ও অক্ষম বলিয়া কৃপা করিতেছেন, সন্তান বলিয়া স্নেহ করিতেছেন। তিনি কৃপা ও স্নেহ করিয়া আমারদিগকে উন্নতির অধিকার—তাঁহাকে লাভ করিবার অধিকার দিতেছেন। সে দানের বিশ্রাম নাই। পিতৃদত্ত অধিকার বলে আমরা সকল কার্য্যেই উদ্যোগী। যিনি আমারদের হৃদয়ের স্বামী তাঁহার ও আমাদের মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান চিরকালের নিমিত্তে না থাকে এজন্য উদ্যোগ ও যত্নই আমারদের উপায়। উদ্যোগ ও যত্নের ফলে দেশের দূরত্ব ও কালের ব্যবধান নষ্ট হইতে পারে। মনুষ্যের ঈশ্বরদত্ত অধিকার যতই প্রস্ফুটিত হইতেছে, যত্নের ফলে দেশ ও কালের সহিত মানবের যে অনিবার্য্য সম্বন্ধ তাহা তত ক্রমেই সঙ্কোচিত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যের মানসের এমনি প্রকৃতি যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে পারে, অনাগত কালকে ধৃত করিয়া আশা-কৃত কার্য্যের মানচিত্র করিতে পারে। এইরূপে মানব মানস-পটে অগ্রেই আপনার উদ্যোগ-সূত্রে দেশ কালের পরাজয় চিত্রিত করেন। পশ্চাৎ তদনুসারে দ্রুতগমনক্ষম রথাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মনের

ইচ্ছাকে চরিতার্থ ও দেশকালকে সঙ্কোচিত করেন। সেইরূপে দৃঢ়ব্রতী হইয়া দুরবগাহ্য বহুকাল-সাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে অল্পকাল-মধ্যেই হৃদয়ে আকর্ষণ করত ব্রহ্মলাভ করিতে সক্ষম হন। মানবের উদ্যোগ ও যত্ন যদি আরো বৃদ্ধি পায় তবে তিনি সহস্র-ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া যে ফল লাভ করিতেছেন একস্থানে উপবিষ্ট হইয়াই তাহা করিতে পারিবেন এবং শতবর্ষের কার্য্য এক দিনে নির্ব্বাহ ও শতবর্ষ পরিশ্রমের ফল একদিনে সম্ভোগ করিতে পারক হইবেন। পরমেশ্বরের দয়া ও স্নেহ কর্ত্তৃক ঐ উন্নতির বীজ আমারদের মনোভূমিতে নিহিত রহিয়াছে। যিনি যে পরিমাণ যত্নবারি তাহাতে সিঞ্চন করিবেন তিনি ততই ফল-লাভ করিতে পারিবেন, দেশ-কাল-জনিত বাধাকে ততই অতিক্রম করিবেন।

ইতি দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রকরণ

পরমেশ্বর প্রাকৃতিক ও মানবীয় গুণাতীত-কিন্তু মানবই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

১১। আমারদের ন্যায়গুণ, দয়াগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরে তাদৃশ বিরুদ্ধ ভাব নাই, আমরা যখন বলি তিনি দয়াময়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেই দয়াই তাঁহার ন্যায়াদি সর্ব্বগুণের এক অখণ্ড স্বরূপ। আমরা যখন সেই সব গুণকে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে দেখি তখন তাঁহার পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয় স্বরূপের ভাব পাই না।

তখন কেবল তাঁহার অপূর্ণ খণ্ডভাব গ্রহণ করি। সে ভাব আমারদেরই চিত্রিত ও কল্পিত। তাঁহাতে নর-প্রকৃতির ও ভূত-প্রকৃতির ভাব আরোপিত হইলে তিনি পূর্ণপুরুষরূপে উপলব্ধ হন না। তাঁহার প্রকৃতির গুণাতীত অদ্বিতীয় ভাবই পূর্ণ-পুরুষ-শব্দের বাচ্য। তিনি প্রকৃতির সমষ্টিও নহেন ব্যষ্টিও নহেন; কিন্তু পূর্ণপুরুষ। যতক্ষণ আমরা তাঁহাকে সর্ব্বাতীত, সকলের সার পুরুষরূপে উপলব্ধি না করি ততক্ষণ তাঁহাকে অন্ধ দেখি। তাঁহাকে জীবন্ত, জ্বলন্ত, পুরুষ রূপে গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার প্রতি আমারদের বিশ্বাস অটল হয় না। তাঁহার ঐ মহাভাব অন্য কোন মহত্তর ভাব হইতে সংগৃহীত নহে এবং তাহা আমারদের আধ্যাত্মিক গুণরাশির সমষ্টিও নহে। সে ভাব সেই পূর্ণ মঙ্গল-পুরুষ-স্বরূপ।

১২। সেই মহাপুরুষের প্রকাশ বিদ্যুল্লতা বা মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় নহে। তাঁহার জ্যোতিঃ সৌদামিনী ও সবিতার প্রকাশক। তাঁহার অস্তিত্ব স্বপ্নবৎ মায়িকও নহে, তিনিই প্রকৃত জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতা। তাঁহার সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ও জ্বলন্ত এবং মানবের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ও জীবন্ত। সেই মঙ্গলের যোগেই বাহ্য জগতের মঙ্গল-শোভা। ঈশ্বরের করুণাবারির বর্ষণ ব্যতীত নদীর মঙ্গল নাই, শস্যের মঙ্গল নাই, ধরার মঙ্গল নাই। তাঁহার জ্বলন্ত মঙ্গল-ভাব সূর্য্যে, চন্দ্রে, মেঘে, পবনে বসতি করে; নতুবা সূর্য্যের প্রভা, চন্দ্রের শোভা, মেঘের দুগ্ধ, পবনের প্রাণ, জগতের ত্রাণ কোথা? তাঁহার মঙ্গলচ্ছটা বাহ্য জগতে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু মানবের সঙ্গেই তাঁহার অন্তরতম সম্বন্ধ। প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাকে আত্মার অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, মনের

মন বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। পিতা মাতার সহিত পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষা তাঁহার সহিত আমারদের সম্বন্ধ কোটিগুণে নিকটতর। তাঁহারই স্নেহ পিতা মাতার হৃদয়ে বাস করে, তাঁহারই নিয়মে পিতা মাতা আমারদের পরম পূজ-নীয় দেবতা। তিনি পরম পিতা মাতার জননী।

১৩। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে পূর্ব্ব বা পর নাই, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন ঈশ্বর ছিলেন না; তাঁহার অন্ত নাই, অতএব তাঁহার অন্ত আশঙ্কা করিয়া আমরা ভবিষ্যতের নিমিত্তে তাঁহার পদে অন্য ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারি না। তিনিই আদি-দেব, তিনিই অনাদি-দেব, তিনি অনন্ত-দেব। তিনি দেশ কালের অতীত রূপে এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্ব্বগত অতি সূক্ষ্ম। আকাশাপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ও সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার অবয়ব নাই, সুতরাং সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ভূত ভবিষ্যৎ তাঁহাকে অধিকার করে না, সুতরাং তিনি সর্ব্ব কাল অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি যত বড় মহান্ তাঁহার যদি তত বড় দেহ হইত, তবে সে শরীর সমগ্র-দেশ ও নিত্য-কালকে পূরিয়া ফেলিত, তাহা হইলে কোন কালে অন্য বস্তু বা জীবের স্থান হইত না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি এত সূক্ষ্ম যে, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন, তিনি এমত অনন্ত-ব্যাপ্ত যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি যেমন সকলের মধ্যে, সব তেমনি তাঁহার মধ্যে বিরাজিত। দেশ, কাল, পদার্থ, জীব, সাগর, ভূধর ধরণী, গ্রহ, উপগ্রহ এবং অসংখ্য অসংখ্য সৌর ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তা ও স্বরূপের এক অদ্বিতীয় পাথারে ভাসিতেছে। আবার তিনি প্রত্যেক জীবে অন্তর্যামীরূপে, সখারূপে বাস করিতে-

ছেন। কিছুই এবং কেহই তাঁহা হইতে বঞ্চিত নহে। তিনি ভৌতিক জগতের সর্ব্ব-ঘটেই বিদ্যমান, কিন্তু "হ্যায় ঘট্‌মে ঘটকী সুধ্ নেহি" সে সব ঘট তাঁহাকে জানে না। কেবল মানবই ঈশ্বরীয় সাদৃশ্য বশতঃ আপন হৃদয়ে তাঁহার করুণাপূর্ণ বিদ্যমানতা বুঝিবার অধিকারী। যে মানবের সুধ্ নাই, সামান্য বাহ্য ঘটে ও তাহার আত্ম-ঘটে প্রভেদ কি? এতাবতা গুণ সম্বন্ধে যাঁহাতে দ্বৈতভাব নাহি, যাঁহাতে আমারদের গুণের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অপূর্ণ গুণ নাহি, যিনি একমাত্র পুরুষ-স্বরূপ, যাঁহার সহিত আমাদের জীবন্ত সম্বন্ধ, যিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান তাঁহাতে আমাদের প্রদত্ত কোন গুণই সংলগ্ন হইতে পারে না।

১৪। আমরা তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলি, কিন্তু তাহা আমাদেরই চিত্রিত। আমাদের সম্বন্ধে এ জগৎসংসার কিছু দিনের জন্য সত্য—আমারদের শরীরই কিছু দিনের জন্য সত্য। যখন আমারদের মৃত্যু হইবে তখন এ সব আর কোন্ কাজে আসিবে? সুতরাং প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে জগতের বর্ত্তমান প্রকার সম্বন্ধ মিথ্যা। মৃত্যুর পর যদি জ্ঞান-নেত্র সহস্র শক্তি ধরে, তবে এই জগৎ আমরা তখন যে কিরূপ দেখিব সে ভাব এখন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে সম্বন্ধ এখনকার পক্ষে মিথ্যা। এখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুকে যেরূপ দেখিতেছি, যদি পঞ্চের অতীত আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত, তবে, সে পদার্থের ভাব আর একরূপ বোধ হইত। কিন্তু জগদীশ্বরের পূর্ণজ্ঞান স্বরূপে জগতের যথার্থ সত্য একেবারেই সঙ্গমিত রহিয়াছে। জগৎ যাহা, আর আমরা যাহা, সে তত্ত্বজ্ঞান যেমত তাঁহার আছে তেমন কোন কালেই আমারদের হইবে না। তিনি সকল সত্যের মূল সত্য। তাঁহার সত্যস্বরূপের সহিত

জগতের সত্যতার তুলনা হয় না। তিনি ইচ্ছা করেন তো অসংখ্য সৌরজগৎ অবধি দেশ কাল পর্য্যন্ত জগতে যাহা কিছু আছে সকলই আত্মস্বরূপের মধ্যে লয় করিয়া লইবেন। তখন এই জগতের যে ভাব হইবে আর এখন ইহার যে ভাব দেখা যাইতেছে, সে উভয় ভাব আমারদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরস্পর বিপ-রীত বোধ হইতেছে; কিন্তু তিনি পরমসত্য ও পূর্ণজ্ঞান এজন্য তিনি ঐ উভয় ভাবের একটি যথার্থ সত্যভাব একেবারেই জানিতেছেন। তাঁহার সেই অসীমজ্ঞানই সত্যস্বরূপ; অতএব আমারদের ক্ষুদ্রজ্ঞান দ্বারা লব্ধ সত্যের ভাব তাঁহাতে আরোপ হইতে পারে না।

১৫। তাঁহার মঙ্গলস্বরূপেরও ঐরূপ ভাব। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানই তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ এবং তাঁহার মঙ্গলস্বরূপই তাঁহার অপর সর্ব্বগুণের একমাত্র রূঢ় অদ্বিতীয় স্বরূপ। কোন্‌টি প্রকৃত মঙ্গল, কোন্‌টি অমঙ্গল এ সত্য নির্দ্ধারণ করা আমারদের পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু তিনি দেশ কালে অনন্ত, সত্যজ্ঞানস্বরূপ, পরমশিবস্বরূপ, সুতরাং তিনি তাহা একেবারে জানিয়া জগতের চিরকল্যাণ সাধন জন্য অজস্র মঙ্গল বর্ষণ করিতেছেন। মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, রাজবিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব, জলপ্লাবন প্রভৃতিকে আমরা অমঙ্গল জ্ঞান করিতে পারি, কিন্তু তিনি সেই সকল মানব-কুল-সংহার-কারী বিপদের মধ্যে থাকিয়া তন্মধ্যে মঙ্গল-বীজ নিহিত করিতেছেন; কালেতে সেই সব বিপদের মূল হইতে মানব প্রভূত মঙ্গল লাভ করিতেছেন। সাংসারিক ও সামাজিক তাবৎ অমঙ্গল হইতে মানবের জ্ঞান, ধর্ম্ম, বল, বীর্য্য আশ্চর্য্যরূপে উৎপন্ন হইতেছে। যেমন শীতান্তে পুরাতন পত্র সকল ঝরিয়া গিয়া বসন্ত-সমাগমে

তরু সকল হরিত-সজ্জায় শোভিত হয়, সেইরূপ বিপদন্তে মানবকুল বসন্ত-শোভা ধারণ করে। যাঁহারা পৃথিবীর বিপদে অত্যাহত হইয়া শরীর ত্যাগ করেন তাঁহারাও লোকান্তরে সেই আনন্দময়েরই আনন্দ-কার্য্যে পুনঃ ব্রতী হয়েন। জগদীশ্বরের অনন্ত মঙ্গলভাব কে বুঝিবে? মঙ্গল-বর্ষণে তিনি কখনই নিবৃত্ত নহেন এবং তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে অমঙ্গলের বিন্দু বিসর্গ নাই। আমারদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ মঙ্গলের ভাব নাই, তাহা সর্ব্বদাই অমঙ্গল-মিশ্রিত। আমারদের জ্ঞান যেমত পরিমিত, মঙ্গলভাবও তেমনি পরিমিত; কিন্তু তাঁহার অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রই মঙ্গলের সাগর। সুতরাং আমরা তাঁহার মঙ্গল ভাব গ্রহণ বা চিত্রিত করিতে পারি না।

১৬। ঐ রূপ তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁহার সত্য স্বরূপ ও মঙ্গল স্বরূপই তাঁহার আনন্দস্বরূপ। আমারদের কখন আনন্দ, কখন নিরানন্দ, কখনও বিপদ্ কখনও সম্পদ্, কখন জন্ম কখনও মৃত্যু; কিন্তু তিনি অচ্যুত ও আনন্দ-নিকেতন।

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব সকল উপভোগ করে।

১৭। এইরূপে সেই আদি-দেব অনাদি-দেব আমারদের জ্ঞান, বুদ্ধির অতীত হইয়া আমারদিগকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, মঙ্গলানন্দ, পরিবেষণ করিতেছেন। তাঁহার কৃপা-বলে তাঁহাকে লাভ করিব বলিয়া তিনি স্বয়ং প্রত্যেক নর-নারীর হৃদি-স্থিত সহজজ্ঞানে আপনি আসীন রহিয়াছেন। আত্ম-নিহিত সেই দেবসেব্য-মৃগমদ-গন্ধে মানবাত্মা মোহিত হইয়া তৎপ্রাপ্তির আশয়ে সতৃষ্ণনয়নে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করেন

কিন্তু তিনি জানেন না যে, তাহা তাঁহার স্বকীয় নাভিকুণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে। পশ্চাৎ বহু তপস্যার ফলে যখন ব্রহ্ম-জ্ঞান আসিয়া মানবাত্মাকে অন্তর্দৃষ্টি করায় তখন সেই ভুবনে-শ্বরকে তিনি জাগ্রত ভাবে, জানিয়া বুঝিয়া দর্শন ও উপভোগ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য বিনা সহজজ্ঞান ও তন্নিহিত প্রেম ভক্তির উন্নতি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ব্রহ্ম-নিরূপণে মতি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ফলকামনা-বিশিষ্ট যাগ যজ্ঞ এবং অযোগ্য প্রার্থনা ও সংসার-বাসনা রহিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ব্রহ্মের অখণ্ড জাগ্রত-ভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না এবং সর্ব্বশাস্ত্রে কহেন যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। সহজজ্ঞানে ব্রহ্মের উদ্দেশে উপাসনা হয় বটে কিন্তু ব্রহ্মবাদীরা বলেন "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। সহজজ্ঞান সকলেরই আছে। তাহা হইতে অজস্রধারে সকলেরই উপাসনা-প্রবৃত্তি উৎসরিত হইয়া কল্পনা ও বুদ্ধির সাহায্যে জগতে নানাবিধ সাধক-সম্প্রদায় সৃষ্ট করিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য বিনা তাহা বিশেষরূপে ঈশ্বরকে জানিবার অধিকার পায় না। অতএব ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্তে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করুন। উপরে ব্রহ্ম-স্বরূপের ও ব্রহ্মসত্তার যে আভাস দেওয়া গেল তাহা জানা ও শুনা হইতে হৃদয়ঙ্গম করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। অনেক শুনিলে বা অনেক বলিলেই যে, ঐ সকল দেব-দুর্লভ ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় এমত নহে। আপনার যত্ন চাই, আপনার সাধনা চাই, অভ্যাস চাই তবে ঐ সকল অমৃতভাব লাভ হইবেক। ঐ প্রকার যত্নের নামই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা। সকলেরই

স্বাধীনতা আছে, আপন আপন চেষ্টায় সকলেই তাহা করিতে পারেন, কিন্তু জগতের আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, যুক্তিপূর্ব্বক বিচার দ্বারা শাস্ত্রের অর্থ-চিন্তা, ও ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য্য মনন করা, ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার পক্ষে এ সকল পরম উপায়। এই সকল পরম উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে যিনি ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপের আভাস পাইয়াছেন সেই মহাত্মাই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন এবং লাভ করিয়াছেন।

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব
ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"

মনের একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্‌যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।"

"তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারেন তাঁহার সকল লোক-প্রাপ্তি হয়, সকল কামনা সিদ্ধ হয়"।

ইতি তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

সংখ্যা ২

দ্বার ভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ ২৮ ফাল্গুন ১৭৯৩ শক, রবিবার।

ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য।

১। পরমেশ্বর আছেন এ বিশ্বাস সর্ব্বত্রেই দেখা যায়। কিন্তু তিনি কি প্রকার তাহার বিশেষ জ্ঞান সর্ব্বত্রে দৃষ্ট হয় না। যদিও সে বিশেষ জ্ঞান, সকলে লাভ করিতে না পারুক, ফলে তদ্বিষয়ে সামান্য জ্ঞান "তিনি আছেন" এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সাধনের তারতম্য, সঙ্গ-প্রভাব, বিদ্যার শক্তি এবং দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে সেই সামান্য জ্ঞানেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ সেই সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান যদি ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিত, তবে ঈশ্বর-সত্তা জীবন-শূন্য ও নীরস হইত এবং সেরূপ বিশ্বাসের কোন অর্থই থাকিত না। ঈশ্বরস্বরূপের সেই সামান্য জ্ঞান হইতে সভ্য বা অসভ্য, প্রাচীন বা আধুনিক কোন জনসমাজ বঞ্চিত নহে। বুদ্ধি আর কল্পনা পরমেশ্বরের সেই সামান্য জ্ঞানকে যতই চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করুক, তাহাকে অনাবৃত করিয়া দেখ—এই সারতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে যে, তাহার মূলাংশ কেবল ঈশ্বরেরই জ্ঞান। সেই জ্ঞানই মনুষ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা, পূজা, প্রার্থনার অবলম্বন। তাহাই মানব-ধর্ম্মের প্রস্রবণ এবং সাধুকার্য্যের উৎসস্বরূপ। ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই সামান্য জ্ঞানমাত্রা থাকাতে মানব কর্ত্তৃক জগতে নানাবিধ উপাসক-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে; উচ্চ উচ্চ মন্দির, মণ্ডপ ও ভজনালয় সকল নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহাই

সম্বল করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের বিশেষ জ্ঞান আহরণে অনেকে সক্ষম হইয়াছেন।

২। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের বিশেষ জ্ঞান গভীরতর। বিশেষ আলোচনা ব্যতীত সে জ্ঞান লাভ হয় না। অনেক শাস্ত্র, অনেক ধর্ম্মপুস্তক, এবং অনেক সাধু, যোগী, দণ্ডী, পরমহংস, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্ম তাহাতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। পরমেশ্বরের নাম সকলেই শুনিয়াছেন, তাঁহার পূজা করিতে হয় তাহা সকলেই জানেন, অনেকে তাঁহার উদ্দেশে নানা কর্ম্মকাণ্ডে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহার বিশেষ তত্ত্ব-লাভ সহজে হয় না। সে তত্ত্বজ্ঞান কঠিন-সাধ্য।

৩। সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মস্বরূপের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় তাহা বুদ্ধি মনের অগোচর, বাক্যের অবচনীয়। সে ভাবকে কল্পনা চিত্র করিতে পারেন না, কবি বর্ণনা করিতে পারেন না, সূর্য্য চন্দ্র দেখাইতে পারে না এবং দেশ ও কাল পরিমাণ করিতে পারে না। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন পুণ্যতীর্থ নাই যেখানে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, কেবল যাঁহারা হৃদয়ের পবিত্র তীর্থে সূক্ষ্ম জ্ঞানযুক্ত অনুরাগের সহিত স্নান করেন, সেই নিষ্পাপ পুরুষেরা, সেই স্বর্গীয়ভাব লাভ করিতে পারেন। যাঁহারদের দৃষ্টি বহির্ব্বিষয়ে—যাঁহারদের যত্ন প্রাকৃত জগতে, তাঁহারা অবনীতে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন, অতুল ধন, মান, বল, বীর্য্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু সেই স্বর্গীয় ধন তাঁহারদের দুষ্প্রাপ্য। পক্ষান্তরে যাঁহারা অন্তরে দৃষ্টি করেন, অন্তর মধ্যে বাস করেন, অন্তর লইয়াই যাঁহার-দের ব্যবসা, তাঁহারাই সহজে সেই দেবদুর্লভ ভাবের

অধিকারী হইয়া থাকেন। এই কারণে যাঁহারা অতি পূর্ব্বকালে কেবল সংসার লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের অসদ্‌ভাব ছিল, আর যাঁহারা সেরূপ ব্যস্ত না হইয়া অনুরাগের সহিত ব্রহ্ম-স্বরূপের বিশেষ জ্ঞান লাভ জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব ছিল না।

৪। হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই ধরণীতে প্রধান। এই ধর্ম্মত্রয়ের শাস্ত্র সকল অন্বেষণ করিয়া দেখ, যে ধর্ম্মের শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ তত্ত্ব অধিক পরিমাণে পাইবে, তাহারই প্রণেতাগণকে অধিক ব্রহ্ম-জ্ঞানী বলিয়া বোধ করিতে হইবেক। যদি এই নিয়মানুসারে চল, তবে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-বাদী ঋষিগণকে সর্ব্ব-উচ্চ আসন প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না। পশ্চাৎ যখন স্বদেশ বিদেশের অন্যান্য শাস্ত্র-প্রণেতাগণের সহিত তুলনা করিয়া জানিবে যে উক্ত ঋষিগণের অপেক্ষা আর কেহই প্রাচীন অথচ উন্নত-ব্রহ্ম-জ্ঞানী ছিলেন না—যে, যখন অন্যান্য দেশ অসভ্য ও অজ্ঞানান্ধ-কারাচ্ছন্ন ছিল তখন তাঁহারাই কেবল ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মের গগণকে ব্রহ্ম-জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তখন তাঁহারদের প্রতি তোমার আরো শ্রদ্ধা জন্মিবে। অতি প্রাচীন-কাল-নিবন্ধন মনোভাব-ব্যক্তোপযুক্ত শব্দের অভাব বশতঃ তাঁহারদের মনোভাব প্রকাশে যে সকল ক্রটি আছে বলিয়া তোমার সহসা বোধ হইবেক, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে শুদ্ধ সেই সব ক্রটি মার্জ্জনা করিতে পারিবে এমত নহে, কিন্তু সেই সকল ক্রটির অভ্যন্তরে নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন দেখিবে।

৫। পরমেশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তিনি এক; তাঁহার সমান, তাঁহা হইতে অধিক বা তাঁহা হইতে অল্প অন্য

পরমেশ্বর নাহি। তিনি সত্তা ও স্বরূপে একই। তিনি আত্মা ও শরীর-মিলিত সত্তা নহেন। তাঁহার আত্মাই তাঁহার সত্তা। সুতরাং শরীর ও আত্মার দ্বন্দ্বজ-দ্বৈত-ভাব তাঁহাতে নাহি। প্রথমতঃ তিনি ভিন্ন অন্য পরমেশ্বর নাহি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্বীয় সত্তাতেও দ্বৈত-ভাব নাহি—এই উভয় পক্ষেই তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং"। অতঃপর তিনি একেবারে অবিভাজ্য অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপকে ভাগ করা যায় না। তিনি "অখণ্ডৈকরসং" একমাত্র অখণ্ড-রস-স্বরূপ। তিনি লৌকিক গুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অথবা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সমষ্টি; বিষয় বা আধার নহেন। তিনি "কর্ম্মাধ্যক্ষঃসর্ব্বভুতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" সর্ব্বকার্য্যের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়,জ্ঞান-স্বরূপ, সঙ্গরহিত, এবং নির্গুণ। এই তৃতীয় ভাবেও তিনি একমাত্র,রূঢ়, অদ্বিতীয়। চতুর্থতঃ তিনি প্রকৃতির অতীত। এবং ভৌতিক বা মানসিক সত্তার ন্যায় কোন সত্তা নহেন; কিন্তু তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ" মহাপুরুষ, সকলের প্রভু ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। পঞ্চমতঃ তিনি দেশ কালের অতীত। তিনি "পর আকাশাৎ"—'পরঃ' কি না, সূক্ষ্মঃ 'আকাশাৎ' অপি। অর্থাৎ আকাশের,কি না, দেশের অতীত। "খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"—তাঁহা হইতে 'খং'—(আকাশ), বায়ু, জ্যোতিঃ, অপ—(জল) ও সকলের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তিনি আকাশের জন্ম-দাতা। স্বয়ং "অচ্ছায়মতমোঽবায়ুনাকাশম্" অচ্ছায়ং—ছায়া নহেন, অতমঃ—অন্ধকার নহেন, অবায়ু—বায়ু নহেন, অনাকাশ—আকাশও নহেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি দেশের, কি না, আকাশের অতীত—আকাশ

যেখানে নাই তিনি সেখানেও আছেন—সমগ্র দেশ অর্থাৎ আকাশ যত দূর—যত অনন্তভাবে বিস্তৃত আছে তিনি "দূরাৎ সুদূরে" (অত্যন্তাগম্যত্বাৎ) দূর হইতেও বহু দূরে—অর্থাৎ অগম্যের যত দূর অত্যন্ত হইতে পারে, সেখানেও আছেন, আবার তিনি "তদিহান্তিকেচ" (তৎ-ইহ-অন্তিকে চ,কি না, সমীপেচ) নিকটেও বর্ত্তমান—তিনি এমনি দয়ালু প্রভু যে, "পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্" 'পশ্যৎসু' চেতনাবৎসু, 'ইহ,' 'এব,' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' আত্মনি অর্থাৎ চেতনাবান্ জীবগণের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন। পরঞ্চ "আকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ" তাঁহার দ্বারা আকাশ ওতপ্রোতভাবে, কি না, সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, তিনি আকাশের বাহিরে আছেন, আকাশের মধ্যে আছেন, আকাশের সর্ব্বভাগে আছেন কিন্তু তিনি নিজে আকাশ নহেন ফলতঃ স্বয়ং আকাশের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং কূটস্থরূপে প্রকাশক। ঐ প্রকারে তিনি কালেরও পরপারে আছেন, কালের মধ্যেও আছেন, কালের প্রত্যেক ভাগে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিন্তু তিনি নিজে কাল নহেন; ফলে কালের প্রকাশকর্ত্তা "সবৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্" 'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ' বৃক্ষাৎ—সংসারাৎ, কালাৎ আকৃতেশ্চ 'পরঃ' 'অন্যঃ'—প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্টঃ 'যস্মাৎ' ঈশ্বরাৎ অয়ং 'প্রপঞ্চঃ'—সংসারঃ পরিবর্ত্ততে। সেই পরমেশ্বর সংসার, কাল ও সাকার বস্তু সমুদয় হইতে প্রধান ও ভিন্ন। যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এখানে পাওয়া যাইতেছে—তিনি 'কালাৎ পর' কাল হইতে প্রধান অর্থাৎ কালের অতীত। অথচ কালাৎ 'অন্য', কি না, কালেতে

সংস্পৃষ্ট অথবা নিজে কাল নহেন এবং কাল তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। "ঈশানো ভূতভব্যস্য সএবাদ্যঃ স উঃ শ্বঃ" যোভূমা 'ঈশানঃ' 'ভূতভবস্য' কালত্রয়স্য, 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'আদ্যঃ' ইদানীং বর্ত্তমানঃ 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উঃ' অপি বর্ত্তিষ্যতে। যিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশান তিনি নিত্য, অদ্যও বর্ত্তমান, ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান থাকিবেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সর্ব্বকাল বর্ত্তমান। "কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ" তিনি কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। কালকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দেশ কালের অতীত। যষ্ঠতঃ যদিও তিনি সত্ত্ব,রজঃ,তমঃ ও শব্দস্পর্শাদি লৌকিক গুণসমূহের অতীত কিন্তু

"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ"

'প্রধানক্ষেজ্ঞপতিঃ' প্রধানঃ—প্রপঞ্চঃ ক্ষেত্রজ্ঞো—বিজ্ঞানাত্মা তয়োশ্চ পালয়িতা 'গুণেশঃ' গুণানামীশঃ 'সংসারমোক্ষস্থিতি-বন্ধহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিবন্ধানাং হেতুঃ কারণং। তিনি জড় প্রকৃতি কি ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য জীবাত্মা তাবতের পতি,সর্ব্বগুণের মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। অতএব যদিও তিনি লৌকিক গুণসমূহের অতীত, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ-জগতের ও জীবাত্মার পতি, সংসারের মোক্ষ, স্থিতি, বন্ধের নিমিত্ত যত গুণ প্রয়োজন তাহা সমুদয় তাঁহাতে আছে; এজন্য উক্ত হইয়াছে তিনি "গুণেশ" সর্ব্বগুণের ঈশ্বর। তাঁহার গুণরাশি প্রাকৃতিক বা মানসিক গুণের ন্যায় নহে, কিন্তু তাহা অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ, অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ, অপার-পবিত্র-স্বরূপ, অপরিমেয়-প্রেমস্বরূপ, সত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। এবং সে সমুদয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু তাঁহারই রূঢ় অদ্বিতীয় স্বরূপ, একমাত্র অখণ্ড ও পরিপূর্ণ।

৬। এতাবাতা নিষ্পন্ন হইতেছে যে, তিনি এক অদ্বিতীয়, নির্গুণ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পরম পুরুষ, দেশ কালের অতীত এবং সর্ব্বগুণের ঈশ্বর। এই মহাপুরুষকে বাক্য বর্ণন করিতে পারে না "নৈব বাচা", মন ধারণ করিতে পারে না "ন মনসা", বুদ্ধি, যুক্তি ও ধারণার সহিত বহুগ্রন্থ-পাঠেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না "নমেধয়া," অনেক বক্তৃতা শ্রবণ করিলেও তিনি লব্ধ হন না, "ন বহুনা শ্রুতেন," তিনি চক্ষুর অগোচর "অদৃষ্টং", কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য "অব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যং," তিনি কোন লক্ষণদ্বারা গম্য নহেন "অলক্ষণম্", চিন্তাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে পারেনা "অচিন্ত্যম্"; কেবল যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।

"যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ,
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।"

'যম্ এব' ব্রহ্মাত্মানম্ 'এষঃ' সাধকঃ 'বৃণুতে' প্রার্থয়তে 'তেন' সাধকেন 'লভ্যঃ'। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে উপস্থিত না হইয়া, আত্মস্বরূপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। স 'এষ' 'আত্মা,' কি না, ব্রহ্মাত্মা 'তস্য' আত্মকামস্য 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তনুম্'।

৭। ব্রহ্ম-তত্ত্ব অতীব মহৎ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন পৃথিবীর অন্যান্য বর্ষ অজ্ঞানে আবৃত ছিল, তখন ভারতের ব্রহ্মোৎসব-ক্ষেত্র ঐ সকল মহা মহা সত্যে ও জ্বলন্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানে আলোকময় হইয়াছিল। পশ্চাৎ অন্যান্য যত দেশে ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচিত ও শাস্ত্রবদ্ধ হইয়াছে সে সকল

পাঠ করিলে তাহা হইতে ভারত-প্রকাশিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের তুল্য—ভারতের আবিষ্কৃত সত্যসমূহের তুল্য কিছুই পাওয়া যায় না। ফলতঃ কোরাণ ও বাইবেলকে উপনিষদের সহিত কিছুতেই তুলনা করা যাইতে পারে না। উপনিষদের শ্রেণীর এক খানি শাস্ত্রও মুসলমান বা খৃষ্টানদিগের মধ্যে নাই। তাঁহারদের যাহা আছে তাহা কোরাণে ও বাইবেলেই আছে; কিন্তু কোরাণ ও বাইবেলের একটি অধ্যায়ও ঈশ্বরের স্বরূপ-বর্ণনে উপনিষদের নিকটেও আসিতে পারে না। উপনিষদের প্রকাশিত জ্বলন্ত-সূর্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের তো কথাই নাই, কতিপয় পুরাণ, কতিপয় তন্ত্র, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, যোগ-বাশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি যে সকল আলোক-মালায় ধার্ম্মিক হিন্দুগণের গৃহ ও দেবালয় উজ্জ্বল হয়, বাইবেল ও কোরাণকে তাহার কোন একটি আলোক-সন্নিধানে উপস্থিত কর, খদ্যোতের ন্যায় বোধ হইবেক। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত রজনীযোগে সেই সকল খদ্যোত সুতরাং আলোক দিতে পারে, কিন্তু আলোকমালা-উপশোভিত সভাকুট্টিমে অথবা জ্ঞান-সূর্য্য-প্রভায় আলোকিত প্রশস্তক্ষেত্রে তাহারদিগকে উপস্থিত করিতে লজ্জা-বোধ হয়; তথাপি যাঁহারা কোরাণ ও বাইবেল সম্বল করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম সম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া ভ্রমেন, তাঁহারদের সেই গর্ব্ব খর্ব্বের নিমিত্তে এবং যাঁহারা খৃষ্টানদিগের প্রকাশিত ঈশ্বর-স্বরূপকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করত ভারতীয়-ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেন তাঁহারদের ভ্রম-প্রদর্শনার্থে দুই একটি উদাহরণ দেওয়ায় হানি নাই।

৮। প্রথমেই, ভারতের উপনিষৎ-শাস্ত্র ব্রহ্মকে যে ভাবে "এঁকমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া উল্লেখ করেন বাইবেল ও কোরাণ

তাঁহাকে সে ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শেষোক্ত উভয় ধর্ম্মপুস্তকই ঈশ্বরকে এক ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়াও তাঁহার সত্তা ও স্বরূপের মধ্যে ভিন্নতা রাখিয়াছেন। যেমন সূর্য্য একস্থানে আছেন, তাঁহার আলোক সর্ব্বত্রে; সেইরূপ ঐ দুই শাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর স্বর্গে বসিয়া আছেন কিন্তু সেখান হইতেই সব জানিতেছেন। তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার সত্তা সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা কেবল স্বর্গেতেই উপ-বিষ্ট। তিনি আবশ্যক মতে নবী ও পয়গম্বরগণের নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং ইন্দ্রিয়গাহ্য বাক্য কহিতেন। আবার অন্তর্হিত হইতেন। অতঃপর তাঁহার স্বরূপের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন গুণসকল পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, কেন না, তাঁহার দয়া তাঁহার ন্যায়-বিরুদ্ধ। ন্যায়-বিচার দ্বারা তিনি যাহারদিগকে নরকে প্রেরণ করেন তাহারা সহস্র রোদন করিলেও তিনি আর দয়া করিতে পারেন না। সুতরাং বাইবেল ও কোরাণা-নুসারে তিনি স্বরূপতঃ ও গুণসম্বন্ধে এক না হইয়া খণ্ড খণ্ড হইলেন। উপনিষদে যেমন লেখে যে, তিনি "অখণ্ডৈকরসং" একমাত্র অখণ্ড-রস-স্বরূপ একই অখণ্ড-সৎচিদানন্দস্বরূপ, বাই-বেল্ ও কোরাণের প্রকাশিত ব্রহ্মজ্ঞান তাহার নিকট দিয়াও গেল না। বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সঙ্গে কোন নৈকট্য-সম্বন্ধ নাই। মনুষ্যমাত্রেই আদম ও হাওয়ার সন্তান। আদম ও হাওয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সুতরাং সকল মনুষ্যই সেই আদি পিতা মাতার পাপের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। মনুষ্য. যাহাতে সেই সংক্রামক পাপ হইতে অব্যাহতি পায় সে নিমিত্তে ঈশ্বর আপন পুত্র যিসুখৃষ্টেতে চিরকালের জন্য স্বকীয় সমুদয় দয়া হস্তান্তরিত

করিয়াছেন সুতরাং সকলেই যখন পাপী তখন সকলকেই খৃষ্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। যাহারা তাহা না হয়, তাহারা অন্তে চিরকালের নিমিত্তে নরক-নাথ সয়তানের শাসনাধীন হয়, আর কখনও ঈশ্বরের রাজ্যে আসিতে পারে না। ঈশ্বর আর তাহারদের কোন গতি করিতে পারেন না।* অতএব বাইবেল-মতে ঈশ্বর পাপীর গতি—দীনবন্ধু নহেন, এবং মানবের প্রিয়তম পরমাত্মাও নহেন, কেন না, মধ্য-পথে খৃষ্ট রহিয়াছেন। যদিও বাইবেলে অনেক স্থানে ঈশ্বরকে দয়াময় বলেন, কিন্তু সে দয়ায় মানবের অধিকার নাই, মানবের সম্বন্ধে তিনি নির্দয় কিন্তু খৃষ্ট দয়ালু। খৃষ্টের হস্তধারণ না করিলে পরমগতি লাভ হয় না। বাইবেল-মতে পরমেশ্বরের যে ন্যায় গুণ আছে, তাহাতে দয়ার স্পর্শ মাত্র নাই, সে নীরস ন্যায়। সে ন্যায়ও আবার মানবের কোন কার্য্যে আসে না, কেন না, মানবমাত্রেই পাপী; তাদৃশ ন্যায় লইয়া মানব কি বিপদে পড়িবে? এই এক ন্যায় আর দয়ার সামঞ্জস্য অভাবে বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরস্বরূপ নিরানন্দময়, অমঙ্গলময়, নির্দয়, পাপীর অগতি, মানবের অপরমাত্মীয় ও খণ্ড খণ্ড গুণযুক্ত

* ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জেনেরেল ষ্টুয়ার্ট নামক এক জন ব্রিটিস্ সৈন্যাধ্যক্ষ হিন্দুদিগের পক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন যে, "Such notions seem inconsistent with the goodness of the deity and his justice; which doubtless, apportions to each individual the just measure of retribution. * * * * Such are the Sentiments of the Bramhins and I leave the Missionaries to answer them."—অর্থাৎ ঈশ্বর-স্বরূপের এ প্রকার হীনভাব,ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের ও ন্যায়গুণের বিরুদ্ধ। ঈশ্বর অবশ্যই কৃতকর্ম্মের পরিমাণ মত প্রত্যেকের গতি বিধান করেন। * * * * * ব্রাহ্মণদিগের এই অভিপ্রায়। পাদরী সাহেবেরা তাহার উত্তর প্রদান করুন।

হইতেছেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র কি শান্তিপ্রদ!—তদনুসারে ঈশ্বরস্বরূপ আনন্দময়, মঙ্গলময়, দয়াময়, পাপীর গতি, পরমাত্মা ও অন্তরাত্মা ও অখণ্ডরসস্বরূপ হয়েন। ঈশ্বরেতে জড়-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম না থাকায় যেমন হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহাকে নির্গুণ কহেন, বাইবেল অনুসারে তাঁহার সেই সকল গুণ থাকা দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং তিনি সে ভাবে সগুণ হইলেন। পক্ষান্তরে হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বরকে মানবের সকল মঙ্গলের বিধাতা জানিয়া যে ভাবে "গুণেশ" সর্ব্বগুনের ঈশ্বর কহেন, সে ভাবে বাইবেল-মতে পরমেশ্বর নির্গুণ হইতেছেন।

৯। হিন্দুশাস্ত্রমতে নরক-ভোগের অন্ত আছে। পিতা যেমন দণ্ড দিয়া সন্তানকে সাধু-পথে আনেন, পরমেশ্বর সেইরূপ তাঁহার পাপী সন্তানগণকে গ্লানিদ্বারা দণ্ড দিয়া অবশেষে পরমানন্দ প্রদান করেন।* ফলতঃ পাপবিদ্ধ হইলেই মানবের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মানব তখন ঈশ্বরকে প্রার্থনা করে; হিন্দু-শাস্ত্র-মতে পরমেশ্বর সে প্রার্থনা হইতে মানবকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু বাইবেল অনুসারে পাপীর যে নরক-ভোগ হয় তাহার আর অন্ত নাই সুতরাং সে নরক-যন্ত্রণার মূলে মঙ্গলোদ্দেশ্য নাই। এজন্য বাইবেলমতে ঈশ্বর অমঙ্গলস্বরূপ হই-তেছেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তিনি মঙ্গলময়ই রহিয়াছেন।

* গীতা ৫অঃ ১৪ শ্লোকে স্বামী লিখিয়াছেন "নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ-এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্তে"। অর্থ—পরমেশ্বরের নিগ্রহরূপ দণ্ডই অনুগ্রহ—দণ্ড হওয়াতেই পাপীর পাপক্ষয় হয়। এই প্রকার দণ্ডরূপ অনুগ্রহের মর্ম্ম না জানা এক প্রকার অজ্ঞান। সেই অজ্ঞানই পরমে-শ্বরীয় জ্ঞানকে আবৃত করে। তজ্জন্য মানব মোহযুক্ত হইয়া সেই পরমেশ্বরে বৈষম্য দৃষ্টি করেন। বাইবেল সেই অজ্ঞানকে ভেদ করিতে পারেন নাই।

১০। বাইবেলে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উত্তমরূপে বর্ণিত নাহি। সে বিষয়ে যে বাইবেল শুদ্ধ অপটু তাহা নহে কিন্তু তাহা হইতেও অধিক; কারণ বাইবেলে ঈশ্বরের গুণ ও কার্য্য বলিয়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা ঈশ্বর দূরে থাকুন, মানবেতেও প্রয়োগ করিতে লজ্জা বোধ হয়। ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনীয়, মঙ্গলস্বরূপ; বাইবেলে তিনি নিতান্ত পরিবর্ত্তনশীল, রাগান্ধ ও হিংসক রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরকে নিষ্ঠুরের একশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। সে সকল নিষ্ঠুর কার্য্যের নামে হৃৎকম্প হয়। সুপ্রসিদ্ধ টমস্ পেন্ লিখিয়াছেন যে, বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তিনি একটি দানববিশেষ *। ফলতঃ বিবেচনা করিতে গেলে দানব ভিন্ন দেব বা নরে বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বরস্বরূপ সংলগ্ন হয় না।

১১। বাইবেলের এই অবস্থা; কিন্তু ইদানী কৃতবিদ্য পাদরীগণ সহজ জ্ঞান ও যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বাইবেলের উপরি নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিতেছেন। বাইবেলের মর্য্যাদা রাখা ও বাইবেলের অধীনে থাকা নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বাইবেলই তাঁহারদের জীবিকা; অতএব সাধারণ লোকের সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যাহাতে

---

* All our ideas of the justice and goodness of God revolt at the impious cruelty of the Bible. It is not a God just and good, but a devil under the name of God that the Bible describes. There are matters in that book, said to be done by the express command of God, that are as shocking to humanity and to every idea we have of moral justice, as any thing done by Robespierre, by Carrier, by Joseph-le-Bon in France, * * * * * * or by any other assassin in modern times.

বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর-স্বরূপের অনৈক্য না হয়, এমত চাতুর্য্যের সহিত তাঁহারা বাইবেলের লিখিত ঈশ্বর-স্বরূপের দোষ-সংশোধন করিতেছেন। এই নিমিত্তে তাঁহারদের কৃত একটি বক্তৃতা যত ভাল লাগে, মূল বাইবেল দেখিতে গেলে তত ভাল লাগে না। তাঁহারা আপন আপন কৃত বাইবেলের টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে দৃষ্টান্ত-জন্য বাইবেলের যত বচন উদ্ধৃত করেন সে গুলি যেন উজ্জ্বল-গৃহস্থিত মলিন পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কিন্তু আমারদের দেশের কি প্রাচীন টীকা ভাষ্যাদি কি আধুনিক বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদি, সকলের মধ্যেই শ্রুতির বচনগুলি হীরকের ন্যায় দীপ্তি পায়। সহস্র ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা কর, আর তাহার কোন স্থানে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক একটি শ্রুতির শ্লোক দেও, সকলের চক্ষুতে তাহা তোমার বক্তৃতার মধ্যে যেন অন্ধকার গৃহের আলোকস্বরূপ প্রকাশ পাইবেক। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বচন সকল আমারদের বাক্যের জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু পাদরীদিগের বিদ্যাচাতুর্য্যই এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন বাইবেলের প্রদীপ হইয়াছে। তথাপি তাদৃশ বিদ্যা-প্রকাশ দ্বারাও তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। ইওরোপের কি দেবত্রয়-বাদী কি একেশ্বর-বাদী পুরোহিতগণ, কি অধ্যাত্মশাস্ত্র-প্রণেতা দর্শন-কারগণ এখনও অনেক দূর পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ যতদূর নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের প্রকাশিত ব্রহ্মস্বরূপের গাম্ভীর্য্য ও উচ্চতা, সত্যতা ও মিষ্টতা অনেক বেশী।

১২। পার্‌কার আপনার তেজস্বিনী বুদ্ধি ও সরল আত্ম-

প্রত্যয়ের উপরি নির্ভর করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক গুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি বাইবেলের ধৃত দেবত্রয়-বাদ, অনন্ত-নরক, সয়তানের দৌরাত্ম্য এ সকল সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যে সকল সত্য প্রদর্শন করিয়াছেন অনেক ব্রাহ্ম কহেন যে, ইওরোপ ও এমেরিকার অন্য কেহ তাঁহার অগ্রে তাহা জ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল, পূর্ণন্যায় ও প্রেমস্বরূপ, এ সব কথা পার্কারই খৃষ্ট-রাজ্যে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনিই জ্ঞাপন করেন যে, সহজজ্ঞানের উপরি ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বাইবেল, তর্ক ও যুক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়া আরো বলেন যে, পার্কারের গ্রন্থসকল ভারতবর্ষে আসায় ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অধিক সত্য প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল কথার উত্তরে আপাততঃ এইমাত্র বক্তব্য যে, পার্কার পরমেশ্বরীয় জ্ঞান সম্বন্ধে যতই সত্য প্রকাশ করুন—ইওরোপ ও এমেরিকার একেশ্বর-বাদিরা তদ্দারা যতই উপকৃত হউন—অগ্রসর ব্রাহ্মেরা তাহা হইতে যতই ফল-লাভ করুন; ফল কথা এই যে, আমার বিবচনায় পার্কার অথবা অন্য কোন বৈদেশিক আচার্য্যের নিকটে আদি-ব্রাহ্মসমাজ কিছুমাত্র ঋণী নহেন। উক্ত সমাজ প্রথমাবধি আজিও পর্য্যন্ত কেবল শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই, সময়োচিত পরিবর্ত্তন সহকারে প্রচার করিতেছেন। পার্কার প্রভৃতির বিবৃত সত্য শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া একতিলও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫০বৎসর বয়সে পার্কারের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অগ্রে ইওরোপে ঈশ্বরকে কেহ ঐরূপে জ্ঞাত ছিল কি না, এস্থলে সে বিচার করা

যাইতেছেনা, কিন্তু এখন ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, যখন আর আর সমস্ত দেশ অজ্ঞান-তমসাবৃত ছিল, তখন ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সত্য ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঋষিদিগের গ্রন্থে ঈশ্বর-স্বরূপের এমন চিত্ত-তৃপ্তিকর আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্য ভাব পাওয়া যায়, যাহার তুলনা আমি এ পর্য্যন্ত পার্‌কারের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে প্রাচীন কালে মনের সকল ভাব ব্যক্ত করার উপ-যুক্ত শব্দ সৃষ্ট হয় নাই, তখন ঋষিরা আধ আধ বাণীতে এক একটি চতুষ্পদী ও দ্বিপদী শ্লোকে কেমন মনোহর ভাবে, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। পার্‌কার যে সময়ে প্রচার-ব্রত আরম্ভ করেন তখন তো ইংরাজী বিদ্যার উন্নত অবস্থা; কিন্তু ঋষি-গণ যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করেন তখন হয় তো লেখারও সৃষ্টি হয় নাই।

১৩। ঋষিগণের এক একটী কথায় ব্রহ্ম-স্বরূপ যতদূর ব্যক্ত হইয়াছে, পার্‌কারের এক এক খানি গ্রন্থেও তাহা তত-দূর প্রত্যাশা করা যায় না। ঋষিগণ আত্মার মধ্যে পরমেশ্বরের জাগ্রত সত্তা উপলব্ধি করিয়া যে চূড়ান্ত ভাবে পরমেশ্বরকে "পরমাত্মা" বলিয়া গিয়াছেন সেরূপ চূড়ান্ত-স্বরূপ-প্রকাশক একটি ভাব, একটি শব্দও পার্‌কারের কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঋষিরা যে ভাবে ঈশ্বরকে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ও "অখণ্ড-রস-স্বরূপ" বলিয়াছেন, পার্‌কারের কোন পুস্তকে সে ভাব পাই না। বস্তুতঃ পার্‌কার কেবল উন্নত খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক জন দর্শন-কার ও ভক্ত ছিলেন। ধর্ম্মের কোন তত্ত্বের তিনি প্রকাশক নহেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষিরা দর্শন-কার ছিলেন না—তাঁহারদের অনুরাগ-পূর্ণ হৃদয় হইতে

স্বভাবতঃ ব্রহ্ম-স্বরূপ আবিষ্কৃত হইত, আর যেমন আবিষ্কৃত হইত অমনি তাহা তৎকাল-প্রচলিত রীত্যনুসারে ছন্দে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিত। এই কারণে উপনিষদের ঋষিরা বিশেষ যুক্তি, প্রমাণ সহকারে সে সকল ভাব বর্ণন করেন নাই। তাঁহারা হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতেন এবং প্রত্যাশা করিতেন অন্যেরাও হৃদয় দ্বারা তাহা বুঝিবে। তাঁহারা কহিতেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন বহুনা শ্রুতেন"

এই পরমাত্মাকে অনেক বচন দ্বারা বা অনেক শ্রবণ দ্বারা পাওয়া যায় না। কেবল যে সাধক হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রার্থনা করে,

"তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।"

পরমাত্মা কেবল সেইরূপ সাধকের সন্নিধানে আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই রূপ এক একটি ভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। পশ্চাৎ ন্যায় অবধি বেদান্ত পর্য্যন্ত ষড়্‌দর্শন-কারেরা আসিয়া সেই সকল কথা লইয়া টীকা টিপ্পনী করিতে লাগিলেন ইতি।

সংখ্যা ৩।

দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ ১২ চৈত্র ১৭৯৩ শক, রবিবার।

ব্রহ্মের আরোপ এবং ত্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ।

১। বেদের স্থূল স্থূল বিবরণ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইলেই তাহার বলে সব শাস্ত্রের, সব কর্ম্মকাণ্ডের, সমস্ত দেবগণের, মানবাত্মার এবং ব্রহ্মস্বরূপের প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। নতুবা সকলই অসংলগ্ন, সকলই অন্ধকার। বৌদ্ধগণ বেদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিল, কেবল বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাহারা আপনারদিগকেই বড় বলিয়া জানিয়াছিল। মানব যাহাকে বড় বলিয়া জানে, স্বভাবতঃ তাহারই শরণাপন্ন হয়; এখন দেখ বৌদ্ধেরা সেই বুদ্ধি-অভিমানী পূর্ব্বপুরুষগণকেই পূজা করিতেছে। যে দেব দেবীর পূজা ত্যাগ করনোদ্দেশে বৌদ্ধেরা বেদ ত্যাগ করিয়াছিল আবার দেখ ক্রমে ক্রমে সেইরূপ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত করিয়া তুলিয়াছে। মানবের যে অপরিহার্য্য স্বভাব বশতঃ বেদে অসংখ্য দেবের আরাধনা দেখা যায়—সে স্বভাব সময়বিশেষে মানব-সমাজকে আক্রমণ করিবেই করিবে। বৌদ্ধগণের বুদ্ধির আলোচনা ক্ষান্ত হইল আর অমনি ঐ স্বভাব বৌদ্ধসমাজে কার্য্য করত অভিনবরূপে দেব দেবীর স্থাপনা করিল। মানবের ধর্ম্ম-প্রসবিনী, ধর্ম্মরক্ষিণী ও ধর্ম্মভাবের উন্নতিসাধিনী যে একটি প্রকৃতি আছে তাহা বেদ হইতে বেশ জানা যাইতেছে। বেদমধ্যে সেই প্রকৃতির কার্য্য যতদূর দৃষ্ট হয়, তাহা জানিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে

কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উভয় প্রকার উপাসনার তাৎপর্য্য এবং তদুভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝা যাইবে। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-উপাসনার সহিত দেব দেবীর উপাসনার আপাততঃ যতই অসম্বন্ধ ও বিরোধ থাকা বিবেচিত হউক, কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তদুভয়ের মধ্যে এক হম্য-নৈকট্য-সম্বন্ধ স্থাপিত রহিয়াছে।

২। ঋগ্বেদ-সংহিতা যাহা অন্যান্য বেদের অগ্রে প্রকাশিত হয়,—তাহার কোন স্থলে ব্রহ্ম-নাম নাই। কেবল স্থানে স্থানে ব্রহ্ম-শব্দ অন্য তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা প্রথম মণ্ডলের তৃতীয়ানুবাকের তৃতীয় সূক্তের চতুর্থ বচনে যে "ব্রহ্ম" শব্দ আছে, টীকাতে তাহাকে "অন্নং" এবং অষ্টমানুবাকের দ্বিতীয় সূক্তের চতুর্থ বচনে যে "ব্রহ্ম" শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য "হবির্লক্ষণং অন্নং" এবং নবমানুবাকের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় বচনে "ব্রহ্ম"—"স্তোত্ররূপংমন্ত্রং *" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐরূপ "ব্রহ্মাণি" শব্দও 'বেদরূপাণি স্ত্রোত্রাণি,' 'স্তোত্ররূপাণি মন্ত্রজাতানি', 'হবির্ল্লক্ষণানি অন্নানি' ইত্যাদি তাৎপর্য্যে টীকা করা হইয়াছে। অতঃপর পুরাণে যেরূপ বিষ্ণু শব্দে পরমেশ্বরের সত্ত্বগুণস্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া বুঝা যায়, অথবা এখন আমরা যেমন বিষ্ণু শব্দে ব্রহ্মাই বুঝি, ঋগ্বেদ-সংহিতায় উক্ত শব্দের সে অর্থ নাই। তাহাতে "বিষ্ণু" শব্দে 'ব্যাপকতা,' 'ইন্দ্র' ও 'সূর্য্য' বুঝাইতেছে। ফলতঃ সূর্য্যের এক

---

* কর্ম্মীরা মন্ত্র অর্থাৎ বেদকেই ব্রহ্ম বলেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু বেদান্ত সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গের কারণকে ব্রহ্ম বলেন। তিনি বেদেরও কারণ।

নামও বিষ্ণু এবং বিষ্ণুশব্দের মূল অর্থই ব্যাপন-শীল। সূর্য্যও*
ত্রিলোকব্যাপী এবং ইন্দ্র বিষ্ণুর সখা। অতএব উক্ত শব্দ ঋগ্বেদ-
সংহিতায় স্থূলতাৎপর্য্যে ‘সূর্য্য’ ও ‘ইন্দ্র’ ও সূক্ষ্মতাৎপর্য্যে ‘ব্যাপক’
বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখন তাহা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের
নিকটে স্থূল তাৎপর্য্যে ‘চতুর্ভুজ জলদবর্ণ পুরুষোত্তম’ এবং
শ্রেষ্ঠাধিকারীগণের নিকটে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
ঋগ্বেদ-সংহিতায় বর্ত্তমান শিব অর্থাৎ মহাদেবের তাৎপর্য্য-
বোধক কোন শব্দও নাহি। রুদ্রনামে যে দেবতার স্তুতি
সকল উক্ত বেদে দৃষ্ট হয় তাহার অর্থ প্রবল বায়ুর অধিষ্টাত্রী-
দেবতা—ঊনপঞ্চাশ বায়ু সেই রুদ্রের ঊনপঞ্চাশ পুত্র—তাঁহার-
দের সাধারণ নাম মরুদ্গণ। এখন আমারদের মধ্যে যাঁহারা
অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী তাঁহারা ভবানীপতি ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম-
পরিধান-বিশিষ্ট ও নাগ-যজ্ঞোপবীতোপশোভিত রূপে যে
দেবতাকে ধ্যান করেন তাঁহাকে রুদ্র কহেন, আর যাঁহারা
জ্যেষ্ঠাধিকারী তাঁহারা ঐ নাম ব্রহ্মের সেই উদ্যতবজ্র, মহা-
ভয়ানক সূক্ষ্মভাবের প্রতি আরোপ করেন, যাহা পাপবিদ্ধ
পুরুষেরা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে কহেন—

“রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্ পাহি নিত্যং”

“হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাদিগকে
সর্ব্বদা রক্ষা কর।”

৩। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ব্রহ্মারও কোন বিশেষ পরিচয়

---

* “বিসুপর্ণোঽন্তরীক্ষাণ্যখ্যৎ”। সূর্য্যস্য ‘সুপর্ণঃ’ শোভনপতনঃ ‘রশ্মিঃ’ ‘অন্তরীক্ষাণি’ অন্তরীক্ষোপলক্ষিতানি লোকত্রয়স্থানানি বি-অখ্যৎ ব্যখ্যৎ বিশেষেণ প্রকাশিতবান্”। সূর্য্যের শোভন-পতন-রশ্মি অন্তরীক্ষাদি ত্রিভুবন প্রকাশ করিয়াছে। ঋ, সং ১ম। ৪১৭।

পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন তাহাতে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, গণপতি, ষড়ানন, রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি কোন দেবতার উল্লেখ নাই। কোন কোন স্থানে "প্রজাপতি ঋষি" এই নাম আছে; কিন্তু সে নামের সম্মুখ-তাৎপর্য্যে এমত কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না যাহা চতুর্ম্মুখ-বিশিষ্ট পৌরাণিক ব্রহ্মাতে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ফলে 'প্রজাপতিঃঋষিঃ' আর 'অগ্নির্দেবতা' এই উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। পশ্চাৎকালে ঐ উভয় দেবতার ভাব ব্রহ্মাতে আরোপিত হইয়াছে, এমত বোধ হইতেছে। অতঃপর যদিও ঋগ্বেদ-সংহিতায় সরস্বতী নামে এক দেবীর উদ্দেশে এমত সকল স্তোত্র-বন্দনা দেখা যায় যে, তাহা বর্ত্তমান সরস্বতী-দেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তথাপি বর্ত্তমান সরস্বতী যেরূপ শ্বেতবর্ণা ও আকার-বিশিষ্টা, বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই, বরং তাহাতে সরস্বতীকে* নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "মহোঅর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা"। 'সরস্বতী' 'কেতুনা' কি না, প্রবাহরূপেণ কর্ম্মণা, 'মহঃ অর্ণ', কি না, প্রভূতং উদকং, 'প্রচেতয়তি', কি না, 'প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি জনান্' অর্থাৎ সরস্বতী স্বীয় প্রবাহরূপ কর্ম্মের দ্বারা লোকদিগকে বহুজল জ্ঞাপন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সরস্বতী নদী † আপনার প্রবাহ

* অপরঞ্চ, ঋগ্বেদ সংহিতায় কোন কোন স্থানে সরস্বতীকে এক প্রকার বহ্নি-মূর্ত্তি বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। "ঈড়া সরস্বতী মহী তিস্রোদেবীর্ম্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ।" সুখোৎপাদক, ক্ষয়রহিত, দীপ্তিমান্, যে ঈড়া, সরস্বতী, মহী তিন বহ্নিমূর্ত্তি,তাঁহারা এই আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করুন। ঋঃ বেঃ ১।১৩১।

† ইহা ব্রহ্মাবর্ত্তের সরস্বতী নদী। ঋগ্বেদের কালে এই নদী প্রবাহমান ছিল কিন্তু মহাভারতের সময় ইহা বন্ধ হইয়াছিল। তখন ইহার গর্ভ বালুদ্বারা পূর্ণ হয়। মহাভারতে ইহাকে বিনশন তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়।

দেখাইয়া লোকদিগকে ইহাই জানান যে, আমাতে অনেক জল আছে। এতাবতা, যে ঋগ্বেদসংহিতা তাবৎ শাস্ত্রের আদি তন্মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের তাৎপর্য্য-বোধক কোন নাম নাই।

৪। ঋগ্বেদ-সংহিতায় এবং এমত কি সাম ও যজুর্ব্বেদের সংহিতা-ভাগেও অধিকাংশতঃ কেবলই সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই সকল জগতীয় প্রভাবশালী পদার্থের উপাসনা দৃষ্ট হয়। যদিও অনেক স্থলেই ঐ প্রত্যেক দেবতাকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে মহৎ ক্ষমতাবান্ ও ধন, ধান্য, ঐশ্বর্য্যের বিধাতা বলিয়া স্তব করা হইয়াছে; ফলে উপাসকগণের লক্ষ্য যে, একমাত্র জগৎপতিতে ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সকলের কারণ ও সকল শক্তির মূলাধার সেই সর্ব্বব্যাপী জগৎপতিকে ব্রহ্ম বলিয়া ঋষিরা নামকরণ করেন নাই।

৫। পশ্চাৎ ক্রমে কতিপয় উজ্জ্বল-বুদ্ধি ঋষির হৃদয়ে সেই জগৎ-প্রসবিতা, নিরঞ্জন ব্রহ্মের অখণ্ড ভাব প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা দেখিলেন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি কেহই স্বয়ম্ভু, ভূমা, ব্রহ্মাণ্ড-পতি নহেন। এক আদি-দেব—অনাদি-দেব তাঁহারদের সকলের মধ্যে, মূলে ও উপরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি যে কেবল ঐ সকল দেবতার মূলে, মধ্যে, ও উপরে রহিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়মিত করিতেছেন। শুদ্ধ যে তাঁহারদিগকেই নিয়মিত করিতেছেন এমত নহে, কিন্তু ঋষিরা দেখিলেন যে, তিনি তাঁহাদের আপনারদেরই আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া বিষয়েতে বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছেন।* আবার তিনি তাবৎ চরাচর

* এই ভাবটি বর্ত্তমান গায়ত্রীর মূল।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব জীবের জীবন, সর্ব্ব পদার্থের সারভাগ প্রাণ-রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

৬। ঋষিরা ঐরূপে যাঁহাকে সকল শক্তির মূল শক্তি, সকলের আত্মা ও জীবন বলিয়া জানিলেন প্রথমে তাঁহার কোন নাম-করণ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তিনি সকল হইতে বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম "ব্রহ্ম" রাখিলেন। সেই ব্রহ্ম সর্ব্ব ঘটে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন জীব কোন পদার্থ তিষ্ঠিতে পারে না; সুতরাং সকলের সার ভাগই "ব্রহ্ম," কিন্তু অসার ভাগ অগ্রাহ্য; এ নিমিত্তে সকল বস্তুর যাহা পরমার্থ, সকল জীবের যাহা জীবন তাহা ব্রহ্মই অর্থাৎ পরমার্থতঃ সকলই ব্রহ্ম—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"। ব্রহ্মই সকলের আত্মা—এজন্য তিনিই আত্মা। সেই আত্মাতে জীব অধ্যস্ত হইয়া আত্মা-নামে উক্ত হয়। পূর্ব্বে তাঁহারা "ব্রহ্ম" শব্দে স্তোত্ররূপ মন্ত্র ও অন্ন বলিয়া জানিতেন, আর মন্ত্র ও অন্নকেই বড় বলিয়া বোধ ছিল। অতএব সেই ব্রহ্ম নামটি জগৎকর্ত্তাকে প্রদান করিলেন, এবং স্বীয় স্বীয় আত্মাকে সকল অপেক্ষা বেশি নিকট, আত্মীয়, প্রিয় ও জাগ্রত বলিয়া জানিতেন, সে জন্য, অথবা বোধ হয়, তিনি জগতের আত্মা এই বোধে, আত্মা নামটিও তাঁহাকে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখিলেন যে, মানবের আত্মায় অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তাহা তো জগৎপতিতে সংলগ্ন হয় না; তখন তাঁহারা বলিলেন যে, "যে আত্মা সকলে নিদ্রা গেলে জাগিয়া থাকেন সেই আত্মা ব্রহ্ম"। ক্রমে ক্রমে সেই আত্মাকে যাহাতে লোকে যথাবৎ উপলব্ধি করিতে পারে, নাম লইয়া আর দ্বন্দ্ব না হয়, এজন্য ঐ আত্মা-শব্দে একটি

"পরম" শব্দ যোগ করিয়া দিলেন। যাহা আমারদের আত্মা তাহা সংসারী ও ব্যবহারিক জীবাত্মা, আর যে উচ্চশক্তি সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা তাহাই পরমাত্মা অথবা মুখ্য আত্মা। তাঁহারা সকল দেব, পদার্থ ও জীবকে ব্রহ্ম কহিয়া ভাবিলেন, কি জানি মানব জগৎ-পতিকেই যদি পরিমিত জগৎ রূপে দর্শন করে অথবা ব্রহ্ম-শব্দে পূর্ব্ব-প্রতিপালিত সংস্কারানুসারে যদি অন্ন ও বেদকেই বুঝে, এজন্য তাঁহাকে পরব্রহ্ম কহিলেন। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তিনি অন্ন ও মন্ত্র হইতে প্রধান। সকলের স্রষ্টা ও প্রকাশক।

৬ (ক)। অনেক সময়ে ঋষিরা স্বীয় স্বীয় আত্মাতে সেই পরব্রহ্মের এতদূর জ্বলন্ত ভাব উপলব্ধি করিতেন যে, তাঁহারা তখন আপন আপন সত্তা ভুলিয়া যাইতেন। তাদৃশ সময়ে সহজেই তাঁহারদের মনে "অহং ব্রহ্ম" এই ভাবটি উদয় হইত। তাদৃশ ব্রহ্ম-ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি না হইলেও তাঁহারা বিচার-কালেও সকলকেই ব্রহ্ম বলিতেন। কিন্তু তাঁহারদের নিজ নিজ চৈতন্য-শক্তি অথবা অন্য পদার্থ যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা পরব্রহ্ম নহে এ বোধ তাদৃশ বিচার-কালে তাঁহার-দের থাকিত।*

৭। এইরূপে ঘোরতর কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য হইতে যখন ভারত-খণ্ডে জগৎপতির মধুর ব্রহ্ম-নাম প্রকাশিত হইল তখন ব্রাহ্মণ উপাধি নবতর তাৎপর্য্যে সুদৃঢ় হইল। পূর্ব্বে যাঁহারা বেদকে ধারণ করিতেন এবং ব্রহ্মা-নামক পুরোহিত

* পথ্য-প্রদান ১৭৪৫শক ১০৮ পৃ।

ছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন * কিন্তু এখন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিরা বিশেষ রূপে ব্রাহ্মণ নাম লইলেন। তাঁহারা যে খণ্ডে বিশেষ রূপে বাস করিলেন তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি-দেশ হইল। ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মর্ষি,ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিৎ প্রভৃতি পবিত্র উপাধি ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণকে প্রদত্ত হইল। ব্রহ্মবোধ-বিহীন ফল-কামনা-বিশিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্মকে এবং ব্রহ্ম-নাম-বিশিষ্ট বেদ, মন্ত্র, অন্ন এবং সঙ্গীতকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করা হইল। ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞানাভিষিক্ত হৃদয় হইতে নিশ্বাসবৎ স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্ম-মন্ত্র-ময়ী পরব্রহ্ম-রহস্য-পরিপূর্ণা পরা-ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রকাশিত হইল। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা এই ভারতবর্ষে এক মহাপ্রবল সম্প্রদায় এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-বংশের সংস্থাপক হইয়া উঠিলেন এবং কালেতে ব্রহ্মরূপ সারত্ব সহকারে বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মকেও নিয়মিত করিতে লাগিলেন।

৮। যখন সেই উন্নত ব্রাহ্মণ-সমাজে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যখন ভারতীয় ধর্ম্ম-

---

* পূর্ব্বে বেদের নাম ব্রহ্ম ছিল, এজন্য যাঁহারা বেদ ধারণ করিতেন তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ ছিল। অতঃপর ব্রহ্মা-নামক পুরোহিতেরাও যে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদসংহিতায় নিম্নস্থ ইন্দ্র-স্তোত্রে আছে। "গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চ্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রতো উদ্বংশ-মিব যেমিরে॥" হে শতক্রতু ইন্দ্র! 'গায়ত্রিণঃ ত্বাং গায়ন্তি' উদ্গাতারা তোমার গান করেন। 'অর্কিণঃ অর্কং ত্বাং অর্চ্চন্তি'—'অর্ক'ং' কি না, অর্চ্চনীয় যে তুমি তোমাকে 'অর্কিণঃ' কি না হোতারা অর্চ্চনা করেন। এবং 'ব্রহ্মাণঃ' কি না ব্রাহ্মণেরা 'ত্বাং উৎ-যেমিরে বংশং ইব' স্বীয় বংশের ন্যায় তোমাকে উন্নত করেন। হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারি প্রকার বৈদিক ঋত্বিক্। তন্মধ্যে এখানে উদ্গাতা, হোতা ও ব্রহ্মা এই তিনের উল্লেখ আছে। সুতরাং এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ "ব্রহ্মা-পুরোহিতগণকেই" নির্দ্দেশ করিতেছে—ব্রহ্মজ্ঞানীকে নহে।

রাজ্যে নবতর বিপ্লব উপস্থিত করিল তখন স্বভাবতঃ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নানা প্রকারের অধিকার সমুৎপন্ন হইল। কেহ ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসক থাকিলেন, কেহ সেই বুদ্ধি-মনের অগোচর ব্রহ্মকে ধারণ করিতে না পারিয়া নিম্নাধিকারে অবতরণ করিতে লাগিলেন। নামে সকলেই ব্রাহ্মণ থাকিলেন এবং ব্রহ্মই যে আদি-দেব, অনাদি-দেব ও দেবাদিদেব তাহাও সকলের জানা থাকিল। জানা থাকিল এই মাত্র কিন্তু অখণ্ডরূপে তাঁহাকে অনেকে ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ব্রহ্মকে ধারণ করিতে পারা যাউক আর না যাউক মানবের হৃদয়ে যে উপাসনা-তৃষ্ণা বিরাজমান, তাহাকে কে স্থগিত করিবে? অতএব তাদৃশ দুর্ব্বলাধিকারী ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন বৈদিক ও পশ্চাতের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে কতক কতক লইয়া ভারতে এক মিশ্র ধর্ম্মের স্থাপনা করিলেন। তাঁহারদের যেমন অধিকার ও তৎকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের যেমন অবস্থা তদনুযায়ী ঐ মিশ্রধর্ম্ম ধীরে ধীরে 'স্বভাবতঃ' প্রকাশ পাইতে লাগিল। নতুবা কোন একজন লোক বা কোন একটি সম্প্রদায় পুরুষ-ব্যাপার দ্বারা বা বুদ্ধিপূর্ব্বক তাদৃশ ধর্ম্ম-কল্পনা করেন নাই। স্মার্ত্ত স্বীয় নবীন স্মৃতিতে জমদগ্নি-প্রণীত এই বচনটি যে উদ্ধার করিয়াছেন—অর্থাৎ—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাংকার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।"

তাহার এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিরা দুর্ব্বলদিগের হিতের নিমিত্তে দয়া করিয়া পুরুষ-ব্যাপার দ্বারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ সেরূপ কেহ করে নাই। উপা-সকেরা ব্রহ্মকে ধারণ না করিতে পারিয়া এক দিকে সেই অখণ্ড-

স্বরূপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার বিবিধ গুণের অনুসারে বিবিধ প্রকার রূপ থাকা মনে করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে সেই সব গুণ লইয়া তাঁহারদের বৈদিক পিতৃপুরুষদিগের দেবগণ ইন্দ্রাদিকে আরোপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কোন কোন স্থলে ভারতীয় আদিম-নিবাসী দানব ও রক্ষকুলের দেবগণেতেও ব্রাহ্মী শক্তির আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রের ভাষ্যকারেরা ও তন্ত্রকারেরা অনেক স্থলে মনে করিয়াছিলেন, বুঝি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা দুর্ব্বলাধিকারীদিগের হিতের নিমিত্তে ব্রহ্মের নানাবিধ গুণানুসারে বিবিধ প্রকার আকার কল্পনা করিয়াছেন। মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভাষ্যে লেখেন যে,

"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ,
যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।"

"যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হয় তাহারা রূপ-কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক।" ফলতঃ এইপ্রকার আদেশেতেই যে অল্পাধিকারীরা রূপ-কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন এমত নহে। তাঁহারা আপনাদের ধারণা ও রুচি অনুসারে ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা করেন, অথবা পরিমিত ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে অগ্রে অন্য দেবতা আছে বলিয়া স্থির করেন ও ব্রহ্ম-লক্ষ্যেই তাদৃশ দেবতার উদ্দেশে পূজা বন্দনা করিয়া থাকেন; পশ্চাৎ ঐরূপ দেবে অপরিমিত ব্রহ্মের আরোপ হইয়া থাকে এইমাত্র। অবশেষে ক্রিয়াপর ব্যবস্থা-শাস্ত্র আসিয়া অনুমোদন করেন যে, "যাহারা অনির্দ্দেশ্য-ব্রহ্ম-উপসনায় অশক্ত তাহারা রূপ নাম অবলম্বন পূর্ব্বক সগুণ-উপাসনা করিবেক।"

৯। এখন সকল দেবতাকে, সকল মানবকে, সকল

পদার্থকে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণন করার মূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

১০। প্রথমতঃ, উপনিষদের ঋষিরা, দেবগণ যে, স্বতন্ত্র উচ্চশক্তি নহেন, তাহা কর্ম্মকাণ্ডীয় ঋষিগণকে জানাইবার নিমিত্তে কহিয়াছিলেন যে, সকলেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা, সকলের প্রাণ, সকলের সার, সুতরাং সকলই ব্রহ্ম। এই কথা বলায় ইহাই প্রকাশিত হইল যে, ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি আদি দেবতারা স্বয়ং বড় নহেন। সকলই সেই আদিদেবের অধিষ্ঠানে বড়। ইহাতে ইন্দ্রাদি বেদগণের স্থূলভাব ও স্বতন্ত্র দেবত্ব আর থাকিল না। "সকলই ব্রহ্ম" এই ঘোষণাতে যদিও ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি আদি দেবতারাও ব্রহ্মই থাকিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে যাহারা দেবতা ছিল না তাহাদের সঙ্গে সমান হইয়া গেলেন। অতঃপর যখন তাঁহারদের প্রতি ব্রহ্ম-আরোপের এই তাৎপর্য্য বুঝা গেল যে, ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা ও প্রাণ ও পূর্ণরূপে সকলেতে বর্ত্তমান বলিয়া ব্রহ্মেরই সর্ব্বব্যাপ্তিত্ব প্রকাশার্থে ঐরূপ বলা হইয়াছে, তখন একটি তৃণের উপরিও স্বতন্ত্ররূপে ইন্দ্রাদির ক্ষমতা রহিল না। কেবল কূটস্থ ব্রহ্মই জয়-যুক্ত হইলেন *। এতাবতা, একভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণ অপর সকলের সহিত সমভাবে ব্রহ্ম; অন্যভাবে দেবত্ব-বিহীন। এই প্রথম সিদ্ধান্ত।

১১। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম সকলেরই আত্মাতে, এজন্য ব্রহ্মদর্শন-কালে আপনার জীবাত্মাকে হেয় করিয়া বা ভুলিয়া গিয়া সকলেই কহিতে পারেন "অহংব্রহ্ম;" কিন্তু কেহই বাস্তবিক

---

* তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকা দেখহ।

ব্রহ্ম নহেন। ঐ প্রকার কথায় অধিক ভক্তি ও ব্রহ্মের প্রতি মানবের বিশেষ মমতা-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকার ভাবের ভাবুক হইয়াই অনেক ব্রহ্মর্ষি আপনার-দিগকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও ঐ ভাবের ভাবুক হইয়াই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এবং শাস্ত্রে এমনও লেখা আছে যে, ইন্দ্রও আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন

"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তংমামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব।"

জ্ঞানস্বরূপ জীবনদাতা ও মরণশূন্য যে ব্রহ্ম তাহা আমিই, আমার উপাসনা করহ। "মামেব বিজানীহি" কেবল আমা-কেই জান। (ইতি কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্রের উক্তি) এইরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করার দুই প্রকার তাৎপর্য্য আছে। এক প্রকার যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানে—কেবল ব্রহ্মদর্শনে—আপন অপেক্ষা ব্রহ্মেতে মমতা বশতঃ তেমন ভাব হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার—এইরূপ বিচারের দ্বারায় "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া স্থির হইতে পারে যে, "আমার আত্মার অন্তরাত্মা ও প্রাণ ঈশ্বরই; সুতরাং আমি আর কে?—তিনিই"। শেষোক্ত এই বিচারের মধ্যে হয় তো কেহ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না। কেন না, বাহ্য-জ্ঞানশূন্য-অন্তর্দ্দৃষ্টি ব্যতীত তাদৃশ উপলব্ধি হয় না। ইতি দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

১২। তৃতীয়তঃ, উপনিষদে যেমন বলিলেন সকলেই ব্রহ্ম, তেমন আবার পুনঃ পুনঃ ইহাও বলিলেন যে, রূপ নামাদি সকলই জন্য এবং নশ্বর এবং ব্রহ্ম সর্ব্বঘটে থাকিয়াও কিছুতে লিপ্ত নহেন; অতএব যদি অধিকার হয় তবে রূপ নাম

নির্দ্দেশের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেই পূজা করা শ্রেষ্ঠ কল্প। উপনিষদের এইরূপ সিদ্ধান্তে সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, বরুণ সকলেই দেবত্ব-শূন্য হইলেন। যখন ব্যবহারিক দেবগণের মধ্যে এই প্রলয়-দশা উপস্থিত হইল, তখন সেই সকল দেবতাদের ভক্তেরা ব্রহ্ম-রূপ জীবন-দান দ্বারা তাঁহারদিগকে জীবিত রাখিলেন। ব্রহ্ম যদিও সকলেতে আছেন কিন্তু উক্ত ভক্তেরা ভাবিলেন যে, ঐ সকল দেবতাতেই তিনি বিশেষরূপে আছেন—যেহেতু উহাঁরা তাঁহারদের ইষ্টদেবতা। ইতি তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

১৩। চতুর্থতঃ, ঐরূপে ব্রহ্মবোধ সহকারে ঐ সকল দেবগণের পূজা করিতে করিতে ক্রমে ভারতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইল। বেদের মধ্যে ইন্দ্র আর সূর্য্য পরস্পর সখা ছিলেন*। সূর্য্যের এক নাম বিষ্ণু* ছিল। ঐ ইন্দ্র ও বিষ্ণু ক্রমে যুগলত্ব ত্যজিয়া একত্বে দাঁড়াইলেন। ইন্দ্র জলদের কর্ত্তা—অসুরনাশক ছিলেন, "সূর্য্য" কি না, বিষ্ণু তমোনাশক, সর্ব্বপাপঘ্ন, ত্রিলোকব্যাপী ছিলেন। উভয়ে অনন্য-মিথুন হইয়া মেঘবর্ণ, চতুর্ভুজ রূপে বর্ত্তমান বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণ হইয়া লোকমধ্যে পূজিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন লোক-দিগকে পর্জন্য-বর্ষণদ্বারা এবং দানব-বিনাশ দ্বারা পালন করি-তেমন এখন সংযোজিত-ক্ষমতাযুক্ত বিষ্ণু সেইরূপ দৈত্য-দানব-নিপাত ও প্রজাদিগকে যথোচিত অন্ন জল পরিবেষণ দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের বজ্র† বিষ্ণুর হস্তের গদা

* "ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা"—স বিষ্ণু ইন্দ্রস্য অনুকুলসখা ভবতি—সেই বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায় ও সখা। ঋঃ সং ১। ১২৭।

† "বজ্রিনং"—বজ্রযুক্তং ঋ ১। ৬৫। "ইন্দ্রোবজ্রী" অয়ং ইন্দ্রঃ বজ্রী—বজ্রযুক্তঃ ঐ ৬২।

হইল। সূর্য্যের বাহন অরুণপক্ষী বিষ্ণুর বাহন গরুড় হইল। সূর্য্যের পত্নী সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নী হইলেন* পূর্ব্বকার ইন্দ্র ও সূর্য্য নামমাত্র থাকিলেন ; সেই বিষ্ণুতে ক্রমে ব্রহ্মত্ব আরোপিত হইল। কিন্তু সূর্য্য ও ইন্দ্রের ক্ষমতাযুক্ত বিষ্ণু জগতের পালনকর্ত্তা এজন্য ব্রহ্মের যে পরিমাণ ক্ষমতা বিষ্ণুতে দৃষ্ট হইল তাহাকে ব্রহ্মের পালন-কর্ত্তৃত্ব বলিয়াই বিবেচনা করা গেল। নতুবা এমত বিবেচনা হয় না যে, ব্রহ্মের পালন-কর্ত্তৃত্বকে অগ্রে স্বতন্ত্ররূপে দৃষ্টি করিয়া সেই খণ্ডিত কর্ত্তৃত্বের রূপ-কল্পনা করত বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। বরং এই-রূপ তাৎপর্য্যেই প্রাচীন বেদসংহিতার সহিত পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঐক্য থাকিতেছে। কিন্তু বিষ্ণুর উত্থানে, ইন্দ্র চিরকালের নিমিত্তে পতিত হইলেন। এই ভাবটিকে ভাল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্তে পুরাণকারেরা কতই অখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাতে বেশ প্রকাশ আছে যে, বিষ্ণু অনেকবার ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

১৪। অতঃপর শিব। বোধ হয় ইনি আদিতে অন্য কোন নামে ভারতীয় আদিম দানব ও রক্ষবংশের দেবতা ছিলেন†। পুরাণে পাওয়া যাইতেছে শুম্ভ, নিশুম্ভ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি দৈত্য ও রক্ষগণ শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবলিঙ্গও সম্ভবতঃ ভারতীয় আদিম দস্যুকুলের দেবতা ছিলেন। যখন

---

* তত্ত্বঃ বোঃ পঃ ভাদ্র ১৭৯১। ৯৫ পৃ। ৪ সংখ্যক টিপ্পনী।

† রাক্ষস জাতীয় দেবতাসকল যে ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যবংশীয় দেবতা হইতে স্বতন্ত্র ছিল এবং বৈদিক ঋষিরা যে সেই রক্ষকুলের দেবগণকে ভয় করিতেন, ঋগ্বেদ-সংহিতায় তাহার প্রমাণ আছে। যথা—"মোষুণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হনা বধীৎ।" হে মরুদ্দেবতাসকল তোমারদের অনুগ্রহে অতি প্রবল রাক্ষসজাতীয় দেবতা যেন আমারদিগকে বধ না করে। ঋ সং ১।৪৬২

দস্যু ও রক্ষ-সমাজ ব্রাহ্মণদিগের নিকটে পরাজিত হইল তখন উভয় জাতি সামাজিকতা-নিবন্ধন অবশ্যই উভয় ধর্ম্মের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ব্বলাধিকারী ব্রাহ্মণেরা দানব-কুলের শিব-দেব ও শিবানী-দেবীকে গ্রহণ করিলেন। রক্ষ-বংশে শিব মহাকাল-মূর্ত্তিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাঘ্রাম্বর-পরিধেয়-বিশিষ্ট, জটাভার ও নাগমালা-শোভিত, শবারূঢ় প্রভৃতি ভয়ানক বেশে ছিলেন। দানবগণ আপনারা যেমন কৃষ্ণবর্ণ ছিল ও তাহারদের আপনারদের যেমন ব্যবহার ছিল, দেবতাও তেমনি ভয়ানক ছিলেন। আর্য্যসন্তান ব্রাহ্মণেরা গৌরবর্ণ ছিলেন, ইহাঁরদের স্বভাবও উৎকৃষ্টতর ছিল—তদনুসারে বোধ হয় শিবকে তাঁহারাই শ্বেতবর্ণ ও মঙ্গলের দেবতা করিয়াছেন। এই কারণে শিব ও কালী পূজায় দস্যু-জাতির সন্তান শূদ্রদিগের অধিকার আছে* কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কেবল দানব-কুলের দেবগণকে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াই ছাড়েন নাই। তাঁহারা কালেতে উক্ত দেবগণকে সম্পূর্ণ বৈদিক বসনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন শিব তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবৃদ্ধ রুদ্রদেব ছিলেন। হিমালয়-শিখরী-তলস্থ কিরাতেরা শিবোপাসক

---

* শূদ্রাদীনাস্তু রুদ্রাদ্যাঅর্চ্চনীয়াঃ প্রযত্নতঃ। যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি তদব্রহ্মণ্যবিষয়মেবমাহ প্রজাপতিঃ। রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষুচ গীয়তে। ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে। (বশিষ্ঠ স্মৃতি ১ম অঃ। তঃ বোঃ ৬ক ৪ভা ১৯১পৃ) শূদ্রাদি জাতি যত্নসহকারে রুদ্রাদি দেবতারই অর্চ্চনা করিবে। প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে যে স্থলে রুদ্রের উপাসনার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে। পুরাণে রুদ্রের আরাধনা ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির পক্ষেই তাহা বিহিত; অন্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) জাতির পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।

ছিল—সুতরাং শিবের ও চণ্ডীর বাসস্থান সেই দেশেই ছিল, তাহা আর পরিবর্ত্তিত হইল না। কিন্তু মনে করা হইল যে, পূর্ব্বকালে আর্য্য-ঋষি দক্ষ-প্রজাপতির যে অনেক কন্যা ছিল, তাহার মধ্যে এক কন্যা হিমালয়ে জন্মিয়াছেন। এইরূপে পূর্ব্বকার বৈদিক ও আসুরিক ভাব একত্রে মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান হর-পার্ব্বতী হইলেন। শুদ্ধ তাহাই হইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। উপনিষদের ভাবও গিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য-জীবন দান করিল। উপনিষৎমতে ব্রহ্মই সার। তাঁহারই পূজা। তাঁহা ভিন্ন কিছু নাই। তাঁহার ভিন্ন আর কাহারো পূজা নাই। অতএব ব্রাহ্মণেরা শিবের লৌকিক গুণানুসারে বুঝিয়া লইলেন যে, ইনি ব্রহ্মের প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব-স্বরূপ। নতুবা ঈশ্বরের প্রলয়-কর্ত্তৃত্বের রূপ-কল্পনা করিয়া তাঁহারা মহাদেব-মূর্ত্তি প্রকাশ করেন নাই। শিবেতে ঐ গুণ আরোপিত হইল এইমাত্র।

১৫। পুরাণে লেখেন ব্রহ্মা ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-স্বরূপ। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের রূপ কল্পনা করিয়া ব্রহ্মাকে প্রকাশ করা গিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারিক ব্রহ্মা * সম্বন্ধে আমার ঠিক সেরূপ অভিপ্রায় নহে। ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার কর্ত্তৃত্বকে বা তাঁহার রজোগুণকে পৃথক্ করিয়া লইয়া যে, সেই শক্তি বা গুণ দ্বারা ব্রহ্মা নামে একটি চতুর্ম্মুখ-বিশিষ্ট দেবতা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে আমার এমত বোধ হয় না। অপরঞ্চ, দানব-বংশের কোন দেবতা ছিলেন বলিয়াও ব্রহ্মাকে কহা যাইতে পারে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বেদসংহিতার

---

* ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা নামে যে দেবতা তিনি নিরাকার। সেই ভাবটি ব্যবহারিক ব্রহ্মাতে প্রয়োগ হইয়াছে।

বর্ণিত প্রজাপতি ঋষি আর অগ্নির্দেবতার মধ্যে একটি নিকট-তর সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র মনু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় মানব-কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রজাপতি ছিলেন। সেই মনুর সন্তান বলিয়া নরের নাম মনুষ্য হইল। সুতরাং তিনিই প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে সেই প্রজাপতি এবং মনু নাম আছে এবং তাঁহার পূজার নিদর্শন মন্ত্রও আছে। পশ্চাৎ কালে বেদত্রয়ের ও ব্রাহ্মণ-খণ্ডের অনেক ভাগ তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কালেতে সেই সকল স্তোত্র বন্দনা অধিক আদরণীয় হইয়াছিল। সেই আদরের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা-পতিঋষিও লোক-সমাজে যথেষ্ট পূজনীয় হইয়াছিলেন। অগ্নিও জাতবেদা পূজনীয় দেবতা ছিলেন। অগ্নি আদিতে কেবল ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি হবির্বাহক ও যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন। ক্রমে তিনি স্বয়ং এক জন প্রধান বৈদিক দেবতা হন। ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে অগ্নিই মানব ও দেব-সমাজের মধ্যবর্ত্তী; কিন্তু অগ্নি পৃথিবীর দেবতা। প্রজাপতিও নরস্রষ্টা। সেই জাতবেদা পার্থিব অগ্নি ও ঐ নরকুল-পিতামহ ও বেদের কিয়দংশ-রচয়িতা মনু-প্রজাপতি এই উভয়ের প্রতিই জন-সমাজের আনুরক্তি ছিল। যজ্ঞকাণ্ডের অবসানে যখন ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান জ্বলিয়া উঠিল, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মেরই উপাসক হইলেন। কিন্তু কালেতে ব্রাহ্মণ-বংশে যাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারী হইলেন তাঁহারা স্থূল ধর্ম্ম উৎপন্ন করিয়া লইলেন। বিষ্ণু ও শিবের বহুল উপাসনা-প্রচারের অগ্রেই তাঁহারা আদিকালের উপাস্য দেবতা অগ্নি ও মানব-কুলের প্রতিষ্ঠাতা মনুপ্রজাপতিকে ব্রহ্মা বলিয়া ভাবিতে ও

পূজিতে লাগিলেন। তাহাতে উক্ত প্রজাপতি ও অগ্নির্দেবতা একত্রে ব্রহ্মা হইলেন। অগ্নি যিনি যাগযজ্ঞের পুরোহিত ও পৃথিবীর দেবতা ছিলেন এবং মনুপ্রজাপতি * যিনি লোকের জনক ও কিয়দংশে বেদের স্রষ্টাও ছিলেন, এখন তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মা হইলেন। ব্রহ্মা এই নামটি পূর্ব্বেও ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যজ্ঞেতে ব্রহ্মানামে এক প্রকার প্রধান পুরোহিত ছিল। কিন্তু অগ্নিই সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং' সুতরাং অগ্নিই বাস্তবিক ব্রহ্মা †। আবার দেখা যাইতেছে ঐ ব্রহ্মাতেই ব্রহ্মের এক-পাদ-স্বরূপ সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব ও হিরণ্যগর্ভত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাতে সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব কেন আরোপিত হইল? তাহার উত্তরে উপরেই বলা গিয়াছে যে, ব্রহ্মা যে অগ্নি ও প্রজাপতির সংযোগে উৎপন্ন তাঁহারা পৃথিবীর দেবতা, প্রজার সৃষ্টিকর্ত্তা ও পুরোহিত ছিলেন। অতএব ব্রহ্মা এক প্রকার পৃথিবী, প্রজা, যজ্ঞ ও বেদের কর্ত্তা থাকায় সুতরাং

---

* ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাকে প্রথম সূক্তের পঞ্চম শ্লোকে "মনু" শব্দে "ব্রহ্মা" অর্থ করা হইয়াছে। "বৃহস্পতে সদমিন্নঃ সুগংকৃধি শংযোর্য্যস্তে মনুর্হিতং তদীমহে"। টীকা—"হে 'বৃহস্পতে' 'সদমিৎ' সদৈব 'নঃ' অস্মাকং 'সুগং' সুখনামৈতৎ সুখং 'কৃধি' কুরু, অপিচ 'তে' তব-স্বভূতং 'শং' শমনীয়ানাং রোগাণাং উপশমনং 'যোঃ' পৃথক্ কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্ করণং 'মনুর্হিতং' মনুনা ব্রহ্মণা হিতং ত্বয্যবস্থাপিতং যদ্বা মনুষ্যাণামনুকূলং এবম্বিধং শমনং যাবনঞ্চ যদস্তি 'তৎ' 'ঈমহে' যাচামহে। অর্থ—"হে বৃহস্পতি! তুমি সর্ব্বদা আমারদিগের সুখ বিধান কর, এবং মনু, কি না, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত তোমার যে রোগোপশম ও ভয়হরণ শক্তি আছে তাহা আমরা প্রার্থনা করি।"—ফলে মনুতে যে ব্রহ্মত্ব আরোপ হইয়াছিল তাহা মনুসংহিতার ১২অধ্যায়ের ১২৩ শ্লোকেও প্রকাশ আছে "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং।" এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি কেহ 'মনুনামক প্রজাপতি' ভাবিয়া উপাসনা করে।

† অগ্নিই যে ব্রহ্মা এসংস্কার সাধারণ হিন্দুসমাজে বেশ প্রচলিত আছে।

তাঁহাতে ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। পৃথিবী, প্রজা, যজ্ঞ, বেদ এই কয়েকটিই প্রধান বিষয়। ইহার যিনি কর্ত্তা তিনি কাজেই সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু যখন ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ-স্বরূপ তখন ব্রহ্মা ব্রহ্মেরই সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বস্বরূপ। কিন্তু স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।

১৬। এতাবতা, প্রাচীন সূর্য্যেন্দ্রে বিষ্ণুত্ব, রুদ্রানিলে ও রক্ষকুলদেবে শিবত্ব, প্রজাপতিঋষি ও অগ্নির্দ্দেবে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব আরোপ করা হইল এবং তাদৃশ বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মাতে ক্রমে পরব্রহ্মের পালন, সংহার, ও সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইল। এইরূপে ভারতবর্ষে ত্রিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ত্রিমূর্ত্তিকে আবার একই ব্রহ্মে পর্য্যাপ্ত ও লয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যেহেতু ব্রহ্মই সকল। ইহাঁরদিগকে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণন করার মূল বৃত্তান্ত এই। ইতি চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

১৭। এই চারি প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখ। প্রথমতঃ, সকল পদার্থেই ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, এই এক ভাবে; দ্বিতীয়তঃ, তিনি সকল আত্মারই অন্ত-রাত্মা, এই আর এক ভাবে; তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রাদি প্রাচীন দেবতাকে সম্মান দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল সেজন্য তাঁহারদিগকে অপর পদার্থ ও মানব অপেক্ষা ব্রহ্মশক্তি দ্বারা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত করা হয়, এই এক প্রকারে এবং চতুর্থতঃ পশ্চাৎকালে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যকে, ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণু নাম দিয়া একে একে ব্রহ্মের সৃষ্টি, সংহার, পালন এই সমগ্র শক্তিত্রয় তাঁহারদিগেতে প্রয়োগ করা হয়, এই আর এক প্রকারে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্মস্বরূপ খণ্ড খণ্ড রূপে নানা ঘটে বিতরিত হইয়াছেন। এই বিভাগের মধ্যে ব্রহ্মেরই সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু ব্রহ্ম সকলেতেই, এই সার কথা যখন উপনিষৎ প্রকাশ করিলেন তখন লোকে তো ব্রহ্মেরই উপাসনা করিলে করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ব্বল-অধিকারীই অনেক। তাঁহারদের সাধ্য কি যে, রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সুতরাং তাঁহারদের যেমন ধারণা-শক্তি, যেমন অভিরুচি, যেমত জ্ঞান সেই অনুসারে সগুণ-উপাসনায় ব্রতী রহিলেন। কিন্তু প্রাচীন দেবগণের ভাব তাঁহারদের হৃদয়ে জাগরুক ছিল, আর এক দিকে দৈত্যগণের সঙ্গ-প্রভাবে তাহারদের কোন কোন দেবতার প্রতিও তাঁহারদের ভক্তি হইয়াছিল; অপরঞ্চ ব্রহ্মের প্রধানত্ব ও আপনারদিগের ব্রাহ্মণ-নামের গৌরব না রাখিয়াও পারেন নাই। এই প্রকার নানা কারণে উক্ত দুর্ব্বলাধিকারী ব্রাহ্মণেরা ভারতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদির উপাসনা-রূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। অগ্রে তাঁহারা ব্রহ্মাকেই প্রধান আকৃতি-বিশিষ্ট দেবতা বলিয়া জানিতেন। পশ্চাৎ ক্রমে মহাদেব ও বিষ্ণুই প্রধান আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রহ্মার মর্য্যাদা কিছু খর্ব্ব হইল। তখন ব্রহ্মার প্রতি গুরুতর দোষারোপ করিয়া তাঁহার পূজা এক প্রকার স্থগিত করা হইল। ইন্দ্রও পাছে আর মস্তক উত্তোলন করেন, এজন্য তাঁহারও বিবিধ দোষ ঘোষণা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা একেবারে রহিত করা হইল। কেবল বিষ্ণু ও মহাদেবের পূজাই সমগ্র দেশকে অধিকার করিল। বিষ্ণুর চিহ্ন শালগ্রাম-শিলা ও বিষ্ণুর নানা অবতারের প্রতিমা এবং শিবের চিহ্ন লিঙ্গমূর্ত্তি ঘরে ঘরে স্থাপিত হইল। কিন্তু উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া কর্ম্মের অধিকাংশ মন্ত্রের মধ্যেই প্রজাপতির্ঋষি ও অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি দেবতার প্রাচীন প্রাধান্য রহিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি

বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণখণ্ডের বিবরণ আর বর্ত্তমান প্রতিমা-পূজার ব্যাপার স্মরণে রাখিয়া যদি বর্ত্তমান কালে কোন এক যজমানের ধর্ম্মানুষ্ঠান দৃষ্টি করেন, তবে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, তাদৃশ যজমান বিবাহকালে সূর্য্য, বায়ু, অগ্নিরাদি দেবতার দোহাই দিতেছেন, কিন্তু গতি, মুক্তি, ধন, ধান্য প্রার্থনার সময় শিব, বিষ্ণু ও পার্ব্বতীকে ডাকিতেছেন। ফলে শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত সর্ব্বপ্রকার দেবকে অবলম্বন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশে। সকল দেবতা, সকল বেদ, সকল কর্ম্মই ব্রহ্মপর। ব্রহ্ম যদিও তুরীয় ভাবে সকলের অতীত, কিন্তু কূটস্থ ভাবে সকল উপাসনায় বিরাজমান। মানবের উপাসনা-তৃষ্ণা ব্রহ্মরূপ বারিই প্রার্থনা করে এবং তাহাই লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। দুর্ব্বল, তাঁহার ভাবকে যতই পরিমিত ও স্থূল দৃষ্টিতে দেখুক, যতই সহজে আপনার বুদ্ধি মনের গ্রাহ্য করিয়া লউক, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পূজা অর্চ্চনায়, সর্ব্ব যজ্ঞে, সর্ব্ব শাস্ত্রে, আদি অন্তে তিনিই উদ্দেশ্য। স্থূল ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের তুরীয় ও কূটস্থ পদে যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করেন তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানী।

১৮। নাম-রূপেতে যতপ্রকার কারণে ব্রহ্মের আরোপ হইয়া আসিতেছে ও আসিতে পারে এবং ব্রহ্মতে যে সমস্ত কারণে ক্ষুদ্রত্ব আরোপ করা হয় নাই ও হইতে পারে না তাহা বিস্তারিত রূপেই বলা গেল। এখন চিন্তা করিয়া দেখ ভারত-ধর্ম্মের পুরাবৃত্তের মধ্যে কতই বিপ্লব কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে তথাপি তাহার মধ্যে কেমন এক আশ্চর্য্য সংযোগ-সূত্র ও ব্রহ্ম-জ্ঞান বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে, ব্রহ্মজ্ঞান ও পশ্চাতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে এবং এমত কি তন্ত্রোক্ত দেবগণপর্য্যন্তে

এক চমৎকার ঐক্য ও ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজ করিতেছে। এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐক্যস্থলের মধ্যেই বর্ত্তমান ভারতীয় ধর্ম্মের প্রাণ বহিতেছে।

১৮ (ক)। ঋগ্বেদ-সংহিতায় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই তিন স্থানকে প্রধান পক্ষে ধরা হয়। ঐ তিন স্থানের তিন জন ব্যবহারিক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পৃথিবীতে জাতবেদা অগ্নি, অন্তরীক্ষে মাতরিস্বা বায়ু অথবা রুদ্র, এবং স্বর্গে সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য। এই তিন দেব ব্যবহারিক সর্ব্ব-দেবের প্রধান। তন্মধ্যে পৃথিবী ও অগ্নির সহিত ঋগ্বেদ, ব্রহ্মা, প্রণবের অ-কার, ব্যাহৃতির ভূঃ, গায়ত্রীর কুমারীরূপ, এবং পরব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের পরস্পর আদি ও অন্ত ভাবাত্মক সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঐরূপ অন্তরীক্ষ ও বায়ুর সহিত সামবেদ, শিব, প্রণবীয় ম-কার, ব্যাহৃতির 'ভুবঃ',গায়ত্রীর বৃদ্ধ রূপ, এবং পরব্রহ্মের প্রলয় কর্ত্তৃত্বের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। ঐরূপ স্বর্গ, সবিতা, যজুর্ব্বেদ, বিষ্ণু, প্রণবের উ-কার, ব্যাহৃতির 'স্ব,' গায়ত্রীর যুবতীভাব, এবং পরব্রহ্মের পালন-শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবভাবের উপরি উত্তরোত্তর দেবভাব আরোপিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত শ্রেণীত্রয়ের সমুদয় দেবভাব একই রূপ-নাম-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মাতে পর্য্যাপ্ত ও লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নস্থ লতাতে তিন শ্রেণীতে ঐ সকল ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ থাকা স্পষ্ট বুঝা যাইবেক।

প্রকরণ	দেবতা	দেবতা	দেবতা
ভূতপদার্থ	পৃথিবী	অন্তরীক্ষ	স্বর্গ
ভৌতিক দেবতা	অগ্নি	বায়ু	বিষ্ণু বা সবিতা

প্রকরণ	দেবতা	দেবতা	দেবতা
বেদসংহিতা	ঋক্	যজুঃ	সাম
পৌরাণিক দেবতা	ব্রহ্মা	শিব	বিষ্ণু
প্রণব	অ	ম	উ
ব্যাহৃতি	ভূঃ	ভুবঃ	স্বঃ
গায়ত্রী-রূপ	কুমারী	বৃদ্ধা	যুবতী
ব্রহ্ম-কর্ত্তৃত্ব	সৃষ্টি	প্রলয়	স্থিতি
গুণ	রজঃ	তমঃ	সত্ত্ব

১৯। মনুস্মৃতিতে ১ম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং॥"

সনাতন ব্রহ্ম যজ্ঞ-কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ দোহন করিলেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের সহিত ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল দেবগণের অধিকারে ঐ সকল বেদ ছিল। ব্রহ্মা তাহা উদ্ধৃত করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এখন এইরূপে গ্রহণ করায় কোন হানি নাই যে, যখন পরোক্ষ ব্রহ্মলক্ষ্যে অথচ ব্যবহারিকরূপে অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্যই উপাস্য দেবতা ছিলেন, তখন তাঁহারদের অধিকারে তাঁহারদের উপাসনার অভিজ্ঞান-স্বরূপ মানবস্বভাব-জাত ঐ বেদত্রয় ছিল। কিন্তু যখন অপরোক্ষ ব্রহ্মের উপাসনা প্রকাশ হইল তখন সে সকল বেদের উপরি ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত; এ জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক বলা হইয়াছে বেদসকলকে ব্রহ্মই প্রকাশ করি-

লেন। কোথা হইতে প্রকাশ করিলেন? এই কথার উত্তরে প্রাচীন দেবগণের মর্য্যাদাই সংস্থাপিত হইতেছে। অর্থাৎ জগৎ-কারণ-ব্রহ্ম-নাম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেদ হয় নাই। বেদ তাহার পূর্ব্বে ছিল। অতএব ব্রাহ্মণেরা বেদত্রয়ের নিমিত্তে পূর্ব্বকার দেবগণের নিকট ঋণী থাকিলেন। এই রূপে মন্ত্র-কল্পে ব্রহ্মকে উহ্য রাখিয়া যে বেদের উপরি ব্যবহারিক অগ্নিরাদি দেবগণের কর্ত্তৃত্ব ছিল, ব্রাহ্মণ-কল্পে তাহা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। ফলে দুর্ব্বলাধিকারী ব্রাহ্মণেরা যখন অগ্নি-প্রজাপতিকে ব্রহ্মারূপে উপস্থিত করিলেন আর সেই ব্রহ্মাতে ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিলেন তখন বেদের উপরি ব্রহ্মারই আধিপত্য হইল। যখন পুরাণ সকল প্রণীত হইয়াছিল, তখন অথর্ব্বনামে চতুর্থ বেদ লোকমধ্যে প্রচলিত থাকায়, পূর্ব্বকার তিন বেদের স্থলে চারিবেদ প্রতি-ষ্ঠিত হয়। অথর্ব্ববেদ অগ্নিরাদি দেবের উপাসনা বা যজ্ঞ-কার্য্যের সহিত উত্থিত হয় নাই। সুতরাং তাহার উপরি অগ্নিরাদির কর্ত্তৃত্ব ছিল না। তবে সে বেদ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব কাহার? ইহার সহজ উত্তর এই যে, সে কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মার * ব্রহ্মা রূপে অবস্থিত পরমাত্মা প্রথম তিন খানি উদ্ধৃত করিয়া-

---

* সূত্রকারগণের উক্তি আছে যে, ঋগ্বেদ হোতা নামক পুরোহিতের; সামবেদ উদ্গাতা নামক পুরোহিতের, যজুর্ব্বেদ অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতের বেদ। অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন উক্তি নাই। প্রশ্ন এই যে, উহা কোন্ পুরোহিতের? এ কথার উত্তর অবশ্যই এইরূপ হইবে যে উহা ব্রহ্মা নামক চতুর্থ পুরোহিতের বেদ। সুতরাং ব্রহ্মা পুরোহিত হইতেই ব্রহ্মা নামটি লইয়া প্রজাপতির্ঋষি ও অগ্নির্দেবতার সহিত সংযোগ করিয়া ব্রহ্মা-দেবতার নামকরণ হইয়াছে এবং পশ্চাৎ তাঁহাতেই হিরণ্যগর্ভ-পদ আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে সংশয় নাই।

ছিলেন কিন্তু চতুর্থ যে অথর্ব্ববেদ তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ ব্রহ্মা যখন ব্রাহ্মণ-সমাজের আদি মূর্ত্তিমান্ দেবতা, আর তিনিই যখন অথর্ব্ববেদ সৃষ্টি করিলেন, তখন তিন বেদ হইতে অথর্ব্ববেদই শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইল। মুণ্ডক-উপনিষদের প্রথমেই আছে যে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভূবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-থর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ। ভরদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং।"

দেবতাদিগের প্রধান ব্রহ্মা সকল বিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে দিলেন, অথর্ব্ব তাহা অঙ্গিরকে, অঙ্গির ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ অঙ্গিরসকে প্রদান করিলেন। ঐ ব্রহ্মবিদ্যাই অথর্ব্ববেদ। যদিও প্রাচীনত্ব-প্রিয় কোন পণ্ডিতই অথর্ব্ববেদকে বেদ মধ্যে গণনা করেন নাই, যদিও মনুস্মৃতিতে কেবল তিন বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাথাপি নানা পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ চারি বেদই ব্রহ্মার মুখের বাণী। ব্রহ্মার চারি মুখ তাহারই পরিচয়-স্বরূপ।

২০। মনুস্মৃতির ২য় অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকে আছে

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ।"

ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ,সাম এই বেদত্রয় হইতে ওঁকারের অবয়বীভূত অকার, উকার, মকার ও ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অকার—ব্রহ্মা, উকার—বিষ্ণু, মকার—শিব আর ভুঃ—পৃথিবী,

ভুবঃ—অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ—স্বর্গ এ সমুদয় বেদ হইতে নির্গত হইল। সুতরাং আমি যে পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁরা ব্যবহারিক বৈদিক দেতার রূপপরিবর্ত্তন মাত্র এবং ক্রমে তাঁহারদের প্রতি ব্রহ্মের সৃষ্টি, পালন, ও সংহার-শক্তি আরোপিত হইয়াছিল তাহা সমুদয় এই একই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল।

২১। ব্রহ্মজ্ঞানীরাই ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। যাঁহারা তাহা না করিতে পারিলেন, তাঁহারা বৈদিক দেবগণের আরাধনার দিকেই হেলায়মান থাকিলেন; কিন্তু ব্রহ্মাকে সকলের বড় বলিয়া জানা হইয়াছে, সুতরাং দেবগণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া তাঁহারদিগেতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিতে লাগিলেন। প্রণব ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দ, তাহাকে বেদের সারোদ্ধৃত বলা হইল; কিন্তু জানা উচিত যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার কোন স্থানেই প্রণব ছিল না। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এসকল ঋগ্বেদ-সংহিতার আদি কল্পে উপাস্য দেবতা ছিলেন। পশ্চাৎ ঐ সকলের অধিষ্টাত্রী দেবতা অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য উপাসিত হন। সেই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য অন্যান্য ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু হন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাই আদি ও সর্ব্বপ্রথমে পূজনীয় ছিলেন। পশ্চাৎ শিব ও বিষ্ণুর পূজা অধিক প্রচারিত হইল এবং ব্রহ্মার পূজা এক প্রকার স্থগিত হইল। উপনিষদের প্রকাশিত ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে অর্পিত হইল, তখন তাঁহারদের বৈদিক ধাতু অনুসারে তাঁহারদের প্রতি ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহরণ-কর্ত্তৃত্ব একে একে আরোপিত হইল। ঐ তিন দেবতা ঐ তিন কর্ত্তৃত্ব যথাক্রমে পাওয়ার

সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। অগ্নি, ঋগ্বেদ ও রজোগুণ-বিশিষ্ট ভূঃ লোকের ঈশ্বর—ব্রহ্মা তাহা হইতে উৎপন্ন অতএব তিনি ওঁকারের "অ" ও ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ও রজোগুণ 'পাইলেন। বায়ু যজুর্ব্বেদ ও তমো-গুণাত্মক ভুবঃ লোকের ঈশ্বর—শিব তাহা হইতে উদ্ভূত, অতএব তিনি ওঁকারে "ম" ও ঈশ্বরের সংহার কর্ত্তৃত্ব ও তমোগুণ পাইলেন। সূর্য্য সামবেদের ও সত্ত্ব-গুণাত্মক স্বর্লোক, কি না, স্বর্গলোকের অধীশ্বর—বিষ্ণু তাঁহা হইতে উৎপন্ন সুতরাং তিনি ওঁকারের "উ" এবং ব্রহ্মের পালন-কর্ত্তৃত্ব ও সত্ত্বগুণ পাইলেন। সূর্য্য সত্ত্বগুণবিশিষ্ট স্বর্গের অধিপতি। বেদসংহিতাতে তিনিই সর্ব্বপ্রধান দেবতা ছিলেন। তিনি পৃথিবী, শূন্যমার্গ ও উপরিস্থ স্বর্গলোকে আলোক দান করেন—সুতরাং তিনি ত্রিলোকব্যাপী। অতএব ওঁকার পূর্ব্বক, অর্থাৎ ত্রিদেবের সমান মান্য রাখিয়া, তাঁহাকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ত্রিলোক-বিশ্বের ব্যাপক করিয়া দৃষ্টি করা হইল। ঋগ্বেদ-সংহিতায় তৃতীয়াষ্টকের শেষ সূক্তের মধ্যে যে গায়ত্রী আছে ঋগ্বেদের টীকা অনুসারে তাহার এইপ্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা ঋগ্বেদে—

"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য
ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।"

ঋগ্বেদের সময়ে ব্রহ্ম নামও ছিল না। তাহাতে কেবল সূর্য্যাদি দেবতা ছিলেন। ইন্দ্র যদিও দেবরাজ ছিলেন, কিন্তু সূর্য্য ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোককে স্বীয় কিরণ দ্বারা প্রকাশ করেন, সেজন্য সূর্য্যকে ঐ গায়ত্রী দ্বারা ধ্যান করা হইতেছে।

'তৎসবিতু'ঃ—তস্য সবিতুঃ
'দেবস্য'—দীপ্তিমানস্য

'বরেণ্যং'—বরণীয়ং
'ভর্গঃ'—তেজঃ
'ধীমহি'—ধ্যায়েমঃ
'ধিয়ঃ'—বুদ্ধিবৃত্তীঃ
'যঃ'—যঃ
'নঃ'—অস্মাকং
'প্রচোদয়াৎ'—প্রেরয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানায়

অর্থাৎ সেই দীপ্তিমান্ সূর্য্যের বরণীয় জ্যোতিঃ ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন।

২২। এই প্রকার অর্থ ব্যতীত ঋগ্বেদের সময়ে গায়ত্রীর অন্য অর্থ থাকা সম্ভব ছিল না। পশ্চাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিরা ব্যবহারিক সূর্য্যাদির দেবত্ব অস্বীকার করাতে গায়ত্রীর অন্য দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ হইল এবং প্রণব ও ব্যাহৃতি তাহাতে যুক্ত হইয়া গেল। যথা—

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো
দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"

'ওঁ'—ইতি জগতাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিশতি।

'ভূর্ভুবঃস্বঃ'—ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রং। ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপৈব, তৎকারণং রূপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে।

'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—ইতি তৃতীয়মন্ত্রং।—

দীপ্তিমতঃ সূর্য্যস্য তদনির্ব্বচনীয়ম্ অন্তর্যামিজ্যোতীরূপং বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং চিন্তয়ামঃ। ন কেবলং

সূর্য্যান্তর্যামী কিন্তু যোঽসৌ ভর্গঃ অস্মাকং সর্ব্বেষাং শরীরিণামন্তঃস্থোঽন্তর্যামী সন্ বুদ্ধিবৃত্তীর্বিষয়েষু প্রেরয়তি।

অর্থাৎ জগতের স্থিতিলয়োৎপত্তির একমাত্র কারণ ব্রহ্ম যিনি ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিলোক-বিশ্ব ব্যাপিয়া নিত্যকাল আছেন, তিনি সেই সূর্য্যের অন্তর্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাকে চিন্তা করি। তিনি কেবলই যে, সূর্য্যের অন্তর্যামী তাহা নহেন কিন্তু সেই তেজঃস্বরূপ আমারদের সকলের অন্তর্যামী যিনি আমারদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন। "তেষাময়ং সংক্ষেপার্থঃ" তাহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে,

"সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদি-সর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিণং চিন্তয়ামঃ"

অর্থাৎ "সকলের কারণ সর্ব্বব্যাপী সূর্য্য অবধি আমারদের সর্ব্বলোকের অন্তর্যামীকে চিন্তা করি।"

২৩। এই অর্থের দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে, পূর্ব্বকার ন্যায় সূর্য্যের তেজকে ধ্যান করা রহিত হইয়াছিল। কিন্তু যিনি সূর্য্যের তেজস্বরূপ, এবং শুদ্ধ তাহাও নহেন আমারদেরও তেজঃ অর্থাৎ অন্তর্যামী অন্তরাত্মা স্বরূপ তাঁহাকেই ধ্যান করার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন পরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনার পরিবর্ত্তে ভারতে কেমন অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত হইল; কিন্তু বাহ্যতঃ সেই প্রাচীন গায়ত্রীই রহিল। জগদীশ্বরের নিয়মই এই যে, মানব স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে—পরোক্ষ হইতে ক্রমে অপরোক্ষে আরোহণ করিবে। এ কালের সূক্ষ্মভাব-প্রকাশক অধিকাংশ শব্দই পূর্ব্বে কেবল সূক্ষ্মকে লক্ষ্য করত স্থূল পদার্থকে জ্ঞাপন করিত, কিন্তু এখন তাহারা

প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করিতেছে। গায়ত্রীর ব্যবহারিক স্থূলভাব ক্রমে সময়ের গতিকে নিরঞ্জন ব্রহ্মভাবে পরিণত হইল। উপরে যে অর্থ দেওয়া গেল তাহাতে ব্রহ্ম-বোধ-বিহীন স্থূল-দ্রষ্টার মনে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। কেন না, তাহাতে ব্রহ্ম সূর্য্যেতেই কেবল নাহি কিন্তু সর্ব্বলোকের আত্মাতে রহিয়াছেন এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্দ্বারা ব্যবহারিক সূর্য্যকে খর্ব্ব করা হইয়াছে। কিন্তু নিম্নে যে, আর এক অর্থ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে সূর্য্যের নামও নাই—

"তৎসবিতুঃ'—তস্য জগৎপ্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ব্বকামানাম্ অন্তর্যামিনো বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ। 'দেবস্য'—দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য। 'বরেণ্যং'—বরণীয়ং। 'ভর্গঃ'—ভর্গং তেজঃ,কি না জ্ঞানং শক্তিঞ্চ। 'ধীমহি'—ধ্যায়েমঃ বয়ম্। 'ধিয়ঃ'—বুদ্ধিবৃত্তীঃ। 'যঃ'—সবিতা, কি না, জগৎপ্রসবিতা। নঃ—অস্মাকং। 'প্রচোদয়াৎ'—প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়।"

অর্থ,—সেই জগৎ প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। কেবল এক "সবিতা" শব্দ যাহার ব্যবহারিক অর্থ সূর্য্য, তাহার অর্থ "জগৎপ্রসবিতা" (জগৎকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) এইরূপে পরিবর্ত্তন করায় গায়ত্রীর তাৎপর্য্য ব্রহ্মপক্ষে যাইতেছে। ফলে আদিতে এই উদ্দেশ্যই উহা ছিল; এখন কেবল তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে এইমাত্র।

২৪। কিন্তু যাঁহারা ব্যবহারিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবে আকৃষ্ট; উপরিউক্ত ত্রিবিধ তাৎপর্য্যের কোন তাৎপর্য্যই তাঁহারদিগের হৃদয়-প্রীতিকর হইল না। (যোগি যাজ্ঞবল্ক্য)——

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েনচ।
উপাস্যং পরমংব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদয়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক।" কিন্তু এ প্রকার ভাবে নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনায় যে সকল ব্রাহ্মণেরা অপারক হইলেন তাঁহারা স্বভাবতঃ সেই বৈদিক সূর্য্য ও পশ্চাতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের আকৃতির সহিত গায়ত্রীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন। বেদ-মতে গায়ত্রী দ্বারা সূর্য্যের তেজকে এবং উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণ-দিগের মতে তদ্দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান-শক্তিকে ধ্যান করিতে হয়; কিন্তু উক্তপ্রকার অপারক ব্রাহ্মণেরা না সে সূর্য্যকে আর প্রধান বলিয়া মানিতে পারিলেন, না ব্রহ্মকেই ধারণ করিতে পারিলেন। তাহা না পারিয়া, তাঁহারা আপনারদের মতানু-সারে গায়ত্রীরই রূপ-কল্পনা পূর্ব্বক, গায়ত্রীতেই দেবত্ব আরোপণ পূর্ব্বক ধ্যান করিবার পদ্ধতি প্রকাশ করিলেন। যথা—

"প্রাতর্গায়ত্রীং কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥"

প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে ব্রহ্মার রূপ-বিশিষ্টা, কুমারী, ঋগ্বেদ-যুক্তা, হংসোপরিস্থিতা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলে উপবিষ্টা ভাবিয়া ধ্যান করিবেক।

"মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চতার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥"

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে বিষ্ণুর রূপ-বিশিষ্টা, গরুড়ারোহিণী, পাতবস্ত্র-পরিধানা, যুবতী, যজুর্ব্বেদযুক্তা, সূর্য্যমণ্ডলে উপবিষ্টা জ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবেক।

"সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভ-বাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাং॥"

সায়ংকালে গায়ত্রীকে শিবরূপিণী, বৃষভারূঢ়া, বৃদ্ধা স্ত্রীর ন্যায়, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থিতা, সামবেদ-সমাযুক্তা ভাবিয়া ধ্যান করিবেক।

২৫। এই কএকটি ব্যবস্থায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সহিত ঋক্, যজুঃ, সাম বেদের একে একে সংযোগ রহিয়াছে এবং সূর্য্যকেও একপ্রকার সম্মান দেওয়া হইয়াছে। এই বচনে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও বৈদিক-ধর্ম্মের মিশ্রভাব দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ভাব গায়ত্রীতেই আরোপিত হইয়াছে। যদিও এস্থানে গায়ত্রী দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মারাধনার ভাব পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রহ্মই যে তাহার লক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাহি। দুর্ব্বলাধিকারীরা যতই কেন রূপকল্পনা করুন না, শাস্ত্রানুসারে সেই সকল প্রকার রূপেতেই ব্রহ্মত্ব আরোপিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মকে ত্যাগ কর, দেখিবে আর ভারতে একটি দেবতাও তিষ্ঠিতে পারিবেন না। ধন্য ভারতীয় ব্রহ্মর্ষিগণ! যাঁহারা অত যজ্ঞ বন্দনার মধ্যে এক ব্রহ্মকে প্রচারিত করিয়া সর্ব্বঘট ব্রহ্মময় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষিগণকে পুনশ্চ ধন্যবাদ যে, তাঁহারা ব্যবহারিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি তাবৎ দেবতাকে নশ্বর বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে মীমাংসকেরা শাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, দুর্ব্বলাধিকারী উপাসকেরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে ঐ সকল পরিমিত দেবগণের উপাসনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পূজাই ব্রহ্মের পূজা। "রূপ-নামাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণ-বিবর্জ্জিত।" তাঁহার রূপ নাই, নাম নাই, বিশেষণ নাই। তাঁহাতে কোন প্রকার রূপের আরোপ হইতে পারে না। যদি

কেহ আরোপ করে, সে অজ্ঞানের কার্য্য। ভারতবর্ষে তাঁহাতে কোন প্রকার রূপ আরোপিত হয় নাই। বরং আদি হইতে ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়রূপে উহ্য থাকাতে, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবগণে এবং ব্রহ্মাদি ব্রাহ্মণ্য দেবগণে, আর চেতন অচেতন তাবৎ পদার্থে কেবল ব্রহ্মত্ব আরোপিত হইয়াছে। এই প্রকার আরোপ দ্বারাই শাস্ত্রের সার্থক্য হইয়াছে এবং ব্রহ্মর্ষিরা যে ঈশ্বরকে কত দূর সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিয়াছিলেন তাহা ইহারই দ্বারা জানা যাইতেছে। শাস্ত্রে যে, কোন স্থলে সব মিথ্যা কহিয়া কেবল ব্রহ্মকে সত্য বলিয়াছেন, কোন স্থলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়াছেন,কোথাও তাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ং" অনুপম ও নির্লিপ্ত কহিয়াছেন,আবার নানা দেবতার আরাধনাকে যে ব্রহ্মপর কহিয়াছেন তাহার এই তাৎপর্য্য। ব্রহ্মরূপ একমাত্র মনোহর তাৎপর্য্য শাস্ত্রের ও দেবগণের সর্ব্বভাগে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। কি সংহিতা, কি ব্রাহ্মণ, কি উপনিষৎ, কি পুরাণ, কি স্মৃতি, কি ভগবদ্গীতা, কি শ্রীমদ্ভাগবত, কি তন্ত্র, কি ষড়্‌দর্শন, সর্ব্ব শাস্ত্রের মধ্যেই ব্রহ্মরূপ পরম তাৎপর্য্য অনলের ন্যায় প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা উদ্দীপিত করিলেই উহা সকল শাস্ত্রের ব্যবহারিক তাৎপর্য্যকে ভস্মীভূত করত ব্রহ্মজ্ঞান উদয় করিয়া দিবেক এবং সাধককে সর্ব্বতোভাবে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেক ইতি।

সংখ্যা ৪

দ্বারভাঙ্গা ২৮ আশ্বিন রবিবার ১৭৯৪।

ঈশ্বরে ভক্তি স্থির রাখিয়া সংসারীয় কার্য্য সাধন করা।

১। এক দিকে ঈশ্বর আর এক দিকে সংসার এই দুই প্রভুর সেবা করা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু সংসার ঈশ্বরেরই প্রিয়-স্থান—তাঁহারই প্রিয়-কার্য্যালয় এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে সংসার-শব্দে প্রভুত্ব প্রয়োগ হইতে পারে না। এক জন পারশ্য-কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, "বিষয়সম্পত্তি স্ত্রীপুত্রাদি সংসার শব্দের বাচ্য নহে, কেবল পরমশ্বেরকে ভুলিয়া থাকাই সংসার"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকিলে ধন জন আর সে সংসার-পদের বাচ্য হয় না যাহাকে লোকে পাপময় কহে, প্রত্যুত তৎসমূহ স্বর্গতুল্য হইয়া উঠে; কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলিয়া ধন জনের প্রতি আনুরক্তি প্রকাশই পাপের হেতু। অতএব তাঁহার প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার এই প্রিয় সংসারকে আদর করা ও সংসার মধ্যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা আমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম,কিন্তু তাঁহাকে ভুলিয়া ইহাতে মগ্ন হওয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মোপদেশের বিরুদ্ধ।

২। এই প্রকার স্বর্গীয় সামঞ্জস্য ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রই দেখাইতেছেন এবং তাহা এই বর্ত্তমান শতাব্দীর সকল সভ্য-দেশেরই ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের অভিমত। বেদের সংহিতা

ব্রাহ্মণে এবং স্মার্ত্তসূত্র ও স্মৃতিনিবন্ধে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা দৃষ্ট হয় না এবং প্রাচীন ও প্রধান প্রধান উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষিগণ সকলেই সংসারী ও মহাকর্ম্মী ছিলেন। অঙ্গিরা, শৌনক, বশিষ্ঠ, জনক, যাজ্ঞবাল্ক্য, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ গৃহস্থ ছিলেন। রাজ্য, ধন, জন, হস্তী, অশ্ব, রথ, গো সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি লইয়া তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। ঐ প্রকার গৃহস্থ ঋষিগণই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও রচয়িতা। এতাবতা, ঈশ্বর ও সংসার এই উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা শাস্ত্র ও ব্যবহার-সম্মত।

৩। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা পরমেশ্বরের জাজ্বল্যমান ভাবে উন্মত্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করত অধিক অবসর লাভপূর্ব্বক যে, ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছিলেন সে স্বতন্ত্র কথা। সেরূপ নিস্বার্থ ও অব্যর্থ মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মাত্মভাব সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। কিন্তু হৃদয়ে সেরূপ ভাব জন্মে নাই এবং তাদৃশাবস্থায় তাঁহারদের ন্যায় শাস্ত্র-পাঠ, গ্রন্থরচনা ও কঠোর প্রচার-কার্য্য করিবার ক্ষমতাও নাই, অথচ আলস্য, ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি কারণে সংসারধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক বাহ্যে সন্ন্যাসী হওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনার বিষয়। যদিও বঙ্গদেশের মধ্যে ঐরূপ বিরক্ত লোক অধিক নাহি কিন্তু বেহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দেখ, অসংখ্য অসংখ্য নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী ও সাধুনামধারী অজ্ঞান পাষণ্ডদিগের সম্প্রদায় সকল দেখিতে পাইবে। তাহারা সাধু নামে আপনাদিগের পরিচয় দেয়, কিন্তু যেমন পুরুষকারে বঞ্চিত, সেইরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের তো কথাই নাই, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া আপনারদের আলস্য ও অভিমানের প্রতিফল ভোগ করিতেছে।

৪। অদ্য কল্য যাঁহারা কার্য্য-বুদ্ধি-প্রদায়িনী ইংলণ্ডীয়-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ভারতের নির্জীব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারদের মধ্যে অনেককেই সম্পূর্ণ নিরলস দেখিয়া নয়ন ও মন প্রফুল্ল হয়। তাঁহারা পুরুষকারের যথা-শক্তি মর্য্যাদা রাখিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা অনেকেই আবার আত্মা, ঈশ্বর ও পরকাল থাকা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা সংক্ষেপতঃ ধর্ম্ম-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ভদ্রতারূপ ফলভোজনে অভিলাষ করেন। কেবল যে, ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন জন্য এত সংখ্যক লোকের হৃদয়কে এইরূপ অনীশ্বর-বাদ অধিকার করিয়াছে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মত-পোষক ইউরোপীয় বহু গ্রন্থ এদেশে আসিতেছে এবং ইংরাজদিগের মধ্যে অনেক মহাত্মা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বন্ধন-চ্ছেদ পূর্ব্বক আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত মতের পোষকতা করিতেছেন। তথাপি, যখন ঐরূপ ঈশ্বর ও পরলোকের বিশ্বাস-বিহীন বিদ্বান্‌গণ আপনারদের গৃহ ও পরিবারের অশেষ মঙ্গল করিতেছেন, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিপক্ষে যত্ন করিতে-ছেন এবং মিষ্টভাষণ, সদালাপ, দানাদি দ্বারা লোক-সমাজে অশেষ আদরভাজন হইয়াছেন, তখন আমরা তাঁহারদের অপবাদ-ঘোষণে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছি; কিন্তু সত্য ও মঙ্গলের অনুরোধে একটি কথা বলা নিতান্তই উচিত বোধ হইতেছে যে, তাদৃশ কৃতবিদ্যগণ কএকটি গুরুতর দোষে দোষী হইয়া রহিয়াছেন। সে দোষ কেবল অনীশ্বরবাদ-সমুদ্ভূত। কেবল যশের দিকে তাঁহারদের দৃষ্টি, স্বার্থ-সাধনার্থে সত্যকে গোপন করা তাঁহাদের ধর্ম্ম, এবং বিজাতীয় ভক্ষ্য দ্রব্য ও সুরা প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা তাঁহারা গোপনে আমোদ করেন,

কিন্তু সে কথা অপরে উল্লেখ করাই তাঁহারদের বিবেচনায় অসভ্যতা। প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা মিনতি ও নম্রতার সহিত সরলভাবে আপনারদের অগত্যা মিথ্যা কহা ও উৎকোচ লওয়ার কথা ভদ্র-সমাজে স্বীকার করিতেন, কিন্তু এই অভিনব বিদ্যা ও সভ্যতা-ভিমানী ব্যক্তিরা তাদৃশ দোষ স্বীকার করা দূরে থাকুক, অন্যে তাহা উল্লেখ করিলে সেই উল্লেখকারীর নামে তাঁহারা হারা সম্মান পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্তে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এইপ্রকারে উক্ত কৃতবিদ্যগণের দ্বারা কোথা ভারতে সত্যের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে, না তাঁহারদের বিজাতীয়-সভ্যতাচ্ছাদিত মিথ্যা-ব্যবহার ও তাহার কু-দৃষ্টান্ত ভারতের অন্তঃসার চূর্ণ করিতেছে। এজন্য আমরা এই প্রস্তাব দ্বারা সকলকে সাবধান করিতেছি যে, তাঁহারা যেন তাদৃশ কোন ভদ্রাভিমানীর বাহ্য সভ্যতায় প্রতারিত না হন। এইরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ফল আপাততঃ প্রকাশ্যে যতই শোভা ধারণ করুক, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর-নিহিত গরলরাশি চরমে মহা অনিষ্ট সাধন করিবে। ঐ নাস্তিকতা কালেতে সংসর্গদোষে অবশ্য স্ত্রীসমাজে সংক্রমিত হইবেক এবং তখন ভারতবর্ষ স্বকীয় প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থিতে তজ্জনিত অসহ্য বেদনা অনুভব করিবেন। এতএব এমত কেহই কহিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ দ্বারা যাঁহারা সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন এবং সংসারের কার্য্যে মনোযোগী রহিয়াছেন, তাঁহারদের দ্বারা সংসারে পাপের বীজ বিক্ষিপ্ত হইতেছে না।

৫। পক্ষান্তরে সংসারের মঙ্গল-সাধন পরিত্যাগ করিয়া যে সকল সম্প্রদায় মহা-অনিষ্টকর ঔদাসীন্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা আর এক দিক দিয়া আলস্য ও কুসংস্কার,

ভণ্ডতা ও মতপ্রিয়তা বিস্তার করিতেছেন। ভগবৎ-বিশ্বাস-বিহীন কার্য্য এবং আলস্যমাখা ঔদাসীন্য এ উভয়ই মহাপাপ। ঈশ্বর স্বয়ং অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছেন—তিনি যদি এক মুহূর্ত্ত কার্য্য স্থগিত করেন, তবে এক মুহূর্ত্তেই জগতের প্রলয়-দশা উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের আদেশে সব হইতে পারে, কেহ কেহ এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, মনে করেন যেন তিনি আদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, আর মেঘ, সূর্য্য, বায়ু, সাগর, ভূধর, চরাচর তাহা প্রতিপালন করিতেছে, সুতরাং তাঁহার স্বয়ং কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবিয়া অনেকে ঈশ্বরকে নিশ্চিন্ত জানিয়া, কার্য্য-বিসর্জ্জন করত তাঁহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এ বিবেচনা সম্পূর্ণ ভ্রম। পরমেশ্বর আপনার জাগ্রত, কর্ম্মশীল সত্তাতে সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাময়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা নিষ্কর্ম্মা নহে। তিনি সর্ব্বত্রে অনবরত কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি মানবের ন্যায় অবকাশের ও বিশ্রামের প্রয়াসী নহেন। বিশ্রাম তাঁহার অনির্ব্বচনীয় জীবন্ত ভাবের বিরুদ্ধ। অতএব নিশ্চিত জানিও যেরূপ কোন ব্যস্তসমস্ত কর্ম্মশীল প্রভুর নিকট তাঁর কোন কর্ম্মচারী কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া সদালাপ করিতে গেলে, কার্য্য না করা অপরাধে উক্ত প্রভু তাঁহাকে রুদ্রমুখ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভৎ´সনা করত তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মে প্রেরণ করেন; সেইরূপ ইহকালেও যদি না হয় পরলোকেও কার্য্যত্যাগী, ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার নিয়মে তাদৃশ কৃত পাপের বিলক্ষণ দণ্ড অনুভব করিবেক। আলস্যের বশতাপন্ন হইয়া "শান্তিঃ" শব্দের ইচ্ছানুরূপ অর্থ করিও না এবং তাদৃশ অন্যায়ার্থ-বিশিষ্ট

আলস্য-মাখা “শান্তি শান্তি” বলিয়া মত্ত হইও না। তুমি যেমন ভাবিতেছ—ঈশ্বরীয় শান্তি সেরূপ আলস্যের অর্থ-বোধিকা নহে, কিন্তু তাহা পাপ ও স্বার্থশূন্য কর্ম্ম-বোধিকা—তাহা বিশ্রাম-বিহীন নিষ্কণ্টক-জীবন্ত-কার্য্য-জ্ঞাপিকা—তাহা আত্মা, মন, বুদ্ধি, সংসার ও পরলোকের নিতান্ত-প্রয়োজনীয় শুভকর্ম্মসমূহ কিরূপ সামঞ্জস্য সহকারে ও কিরূপ শান্তভাবে করিতে হয় তাহারই অর্থ-প্রকাশিকা। অতএব গাত্রোত্থান কর, “শান্তিঃ শান্তিঃ” উচ্চারণপূর্ব্বক ধীর ও শান্তভাবে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্ব্বকর্ম্ম সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত সাধন করিতে থাক। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কার্য্যারম্ভ করিয়াছ—কিন্তু এমত চিন্তা তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনে স্থান দিওনা যে, পর-লোকে গিয়া আর কার্য্য করিতে হইবেক না এবং যোগে যাগে এই কএক দিন সাধু-কর্ম্ম করিয়া পরলোকে তাহার ফল বিশ্রাম লাভ করিব অথবা দেবতাদের সভারূঢ় হইয়া গীত বাদ্য শুনিব। পক্ষান্তরে এই উপদেশ দৃঢ়তররূপে হৃদয়ে ধারণ করিবে যে, আত্মা যেমন অমৃত-পদার্থ ও নিত্যকাল-স্থায়ী মৃত্যুর পর তাহার সম্মুখে তত অনন্ত-পরিমাণ নব নব কার্য্যের ক্ষেত্রসকল নিত্যকাল ধরিয়া প্রকাশ পাইতে থাকিবেক। এখন যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-সহকারে এখানকার কর্ম্ম সাধন করিবেন, তাঁহারা এক দিকে জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য যেমন লোকের নিকটে আশীর্ব্বাদ, ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কার এবং আত্মাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন, অন্যদিকে তেমনি কার্য্যক্ষমতা ও কার্য্যজন্য-বুদ্ধিমত্তা উপার্জ্জন করত পরলোকে উচ্চ উচ্চ স্বর্গীয় কার্য্য-সাধনে উপযুক্ত বল লাভ করিতে পারিবেন। এখানকার কর্ম্মক্ষেত্রে যিনি যে পরিমাণ

ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, পরলোকে তাঁহার ব্রহ্মদর্শনের জ্ঞান-নেত্র সেই পরিমাণে তেজস্বিতা প্রাপ্ত হইবেক এবং সেই আলোকে তিনি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধনে স্বর্গোচিত কৃতকার্য্য হইবেন। নতুবা যাঁহারা এখান হইতে ব্রহ্মদর্শন অভ্যাস করেন নাই তাঁহারা যখন পরলোকে গিয়া দেখিবেন যে, ঈশ্বর-দর্শনের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারদিগকে অবশ্যই পরিতাপ ভোগ করিতে হইবেক। সেইরূপ যাঁহারা কার্য্য-সাধনে না অভ্যস্ত হইয়া পরলোকে যাইবেন তাঁহারদিগকেও প্রচুর পরিতাপের সহিত তখনকার উপায়ানুসারে অভিনবরূপে কার্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবেক।

৬। যিনি যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তিনি ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকেন। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী যেমত পতি-প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে পতির প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, ব্রহ্মোপাসক সেইরূপ ভগবৎ-ভক্তিকে হৃদয়ে জাগরূকা রাখিয়া তাঁহার জগৎকার্য্য সাধন করিবেন। নতুবা অলস হইয়া কেবল ব্রহ্মারাধনা করা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রাহ্মদিগের উপাসনা কেবল ধ্যান করা বা নাম করা নহে, কেবল স্তব-পাঠ বা সঙ্কীর্ত্তন করাও নহে। তাহার সহিত জাগ্রত,জ্বলন্ত,জগদীয় কার্য্যের যোগ রহিয়াছে। যে সকল কার্য্য যথার্থই জগতের উপকারী তাহারই সাধন করা ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান। যাহার যেমন অধিকার তাহাকে তদনুযায়ী জ্ঞান,ধর্ম্ম ও বিদ্যা শিক্ষাদেওয়া ব্রাহ্মদিগের আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। সন্তান সন্ততিকে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া ও সর্ব্বসামঞ্জস্যরূপে সংসার-

যাত্রা নির্ব্বাহ করা ও করিতে না জানিলে তাহার প্রণালী শিক্ষা করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরার্থে ও ঈশ্বরেরই প্রিয়কার্য্য-জ্ঞানে করিতে হইবেক। তাহা হইলেই হৃদয়ে এত পরিমাণ বৈরাগ্য সঞ্চয় হইতে থাকিবেক যে, যদি দৈবাৎ কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া আরব্ধ শুভকার্য্য সুসম্পন্ন না হয়, যদি দৈবাৎ সন্তান সন্ততি ক্রোড় শূন্য করিয়া অকালে চলিয়া যায়, যদি দৈবাৎ অর্থাগম রহিত বা সঞ্চিত ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়, তবে সে সমুদয় বঞ্চনা ও বিপদ্ অবিচলিতচিত্তে তাঁহারই মুখ দেখিয়া সহ্য করা যাইবেক, যাঁহার প্রিয়কার্য্য-জ্ঞানে তৎসমুদয় সাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম এবং স্বয়ং ফলকামনা-শূন্য হইয়া সে সব যাঁহাকে অগ্রেই অর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যত দূর পর্য্যন্ত পুরুষকার দ্বারা দৈবের অত্যাচারকে সম্ভবতঃ নিবারণ করা যাইতে পারে তাহার বিধান অগ্রে না করিতে পারিলে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অকালে ধ্বংস হওয়া জন্য পুরুষ পাপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাদৃশ পাপের যন্ত্রণা যাঁহাকে সহ্য করিতে না হয় তিনিই ঈশ্বরের যথার্থ নিয়ম-প্রতিপালক। ফলে যেরূপ দৈবকে পুরুষকার দ্বারা শাসন করিতে হইবেক, সেইরূপ পুরুষকারকে বিষ্ণু-ভক্তি দ্বারা চর্চ্চিত ও পরিশোভিত করিতে হইবেক; নতুবা তোমার পুরুষকার নরলোকে যতই আদরণীয় হউক কিন্তু তাহা দেবতাদের নিকটে ঘৃণিত হইয়া থাকিবেক ইতি।

সংখ্যা ৫

দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ ৩০ চৈত্র ১৭৯৪ শক শুক্রবার।

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞান।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥"

ইতি কঠোপনিষৎ, দ্বিতীয়াধ্যায়, ষষ্ঠীবল্লী ১২ এবং ১৩ সংখ্যক শ্রুতি॥———

১। পরমেশ্বরকে না বাক্য দ্বারা, না মনের দ্বারা, না চক্ষুর দ্বারা পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন তিনি আছেন তাঁহারাই তাঁহাকে পান, তদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে॥১২॥ তিনি আছেন এই ভাবেও তাঁহাকে পাওয়া যায় আর তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যে তিনি আছেন যাঁহারা এই প্রকারে জানেন, তাঁহার তত্ত্বভাবও আপনা হইতেই তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন॥১৩॥

২। এই দুইটি শ্রুতিতে প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরকে বাক্য, মন, চক্ষুর দ্বারা পাওয়া যায় না। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তিনি শরীর-বিহীন। তাঁহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এ সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ অবস্থিতি করে না। নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত

মিষ্ট বা কর্কশ রবের ন্যায় তাঁহার কোন রব নাহি। অথবা তাঁহার বাক্য বিহঙ্গগণের কলরব; বীণা, বংশী, মৃদঙ্গের ধ্বনি; তুরঙ্গ, করী, কেশরীর গর্জ্জন; কি জলধর-বিস্ফারিত-বজ্র-নির্ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় শব্দায়মান নহে; সুতরাং সেই ভুবন-রাজের বাক্য-শ্রবণে বা কোনরূপ জ্ঞান-লাভে কর্ণ যে নিতান্তই অযোগ্য তাহা বুঝাই যাইতেছে। পরমেশ্বর তদ্রূপ আমারদের চক্ষুরও গ্রাহ্য নহেন। ময়ূরপুচ্ছের সজ্জা, কমলিনী বা কুমুদিনীর লাবণ্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নর নারীর শ্রী, কনক-হিরক-মুক্তার শোভা, অসীম বিস্তৃত নভোমণ্ডল, শ্যামল-শোভান্বিত জলদ-মালা, উন্নতশেখরশোভিত ভূধরশ্রেণী, অতিদূরশায়ী নীলোজ্জ্বল গভীর জলধি, সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ অগ্নির জ্যোতিঃ ইত্যাদি কোন প্রকার সুন্দর ও মহৎ দৃশ্যের ন্যায় পরমেশ্বর আমারদের নেত্রগোচর নহেন; সুতরাং চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তিনি কোন পুষ্প, চন্দন, বা কোন প্রকার সুভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত নহেন; অতএব আমারদের নাসিকা তল্লাভে বিমুখ হইয়াই আছে। তিনি মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ, মাল্য, চন্দন, কীটজ ও লোমজ বস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় অথবা পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রাদির আলিঙ্গনের ন্যায় কোন প্রকার কঠিন বা কোমলস্পর্শবিশেষ নহেন; সুতরাং আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি না। তিনি অম্ল, মধুর, কটু, তিক্ত, কষায়, জলীয় প্রভৃতি কোন রসও নহেন; সুতরাং রসনা তাঁহাকে আস্বাদন করিতে অশক্তই আছে। বাক্যও তাঁহার অস্তিত্ব-বোধকে উৎপন্ন করিতে পারে না। সহস্র গুরু-উপদেশ শ্রবণ কর, তোমার হৃদয়ে যদি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-বিশ্বাস না থাকে, তবে কিছুতেই তাদৃশ বাক্য দ্বারা

তাঁহাকে পাওয়া যায় না; অথবা পরমেশ্বরের স্বর্গীয় প্রেমে হৃদয় অভিষিক্ত হয় নাই; তুমি কেবল মুখে তাঁহার স্তব-পাঠ করিতেছ—সেরূপ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। অতঃপর শিষ্যের যেখানে শ্রবণে সুন্দর অধিকার এবং গুরুর উপাদেয় উপদেশ এ উভয়ই বর্ত্তমান সেখানেও গুরু-বাক্য পরমেশ্বরের গুণ-বর্ণনে বা স্বরূপোপদেশে অক্ষম থাকিয়া যায়। কেন না, ক্ষুদ্র মানব সেই মহানের যশোবর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং তাঁহার অনির্দ্দেশ্য পরমগুহ্য স্বর্গীয়-ভাবকে বাক্য দ্বারা বুঝাইতে অপারক হয়। এই প্রকারে আমরা সকলেই বুঝি যে, আমারদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা সেই ইন্দ্রিয়াতীত—বিষয়াতীত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব লাভ করিতে পারি না। এপর্য্যন্ত সকলই সহজ। আমারদের প্রত্যেকের মনই এই বিচারকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু উপরি উক্ত শ্রুতিতে তদতিরিক্ত আর একটি কথা রহিয়াছে—"ন মনসা" মনের দ্বারাও পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না। আমারদের মধ্যে অনেকেরই এই কথা ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি যে প্রকার এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় যাহা তাহা আমরা যেমন সহজে বুঝি, আমারদের মনের প্রকৃতি এবং মনের বিষয় যে প্রকার তাহা আমরা তত সহজে বুঝি না। অতএব মন শব্দের অর্থ কি ও মন কোন্ প্রকার জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে তাহা অগ্রেই জানা উচিত।

৩। শাস্ত্রানুসারে মন মানব-চৈতন্যের অবস্থা-বিশেষের এক উপাধিমাত্র। আমারদের জীবাত্মা যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের বা তদীয় জ্ঞানের সহিত ব্যাপার করে তাহার

সেই অবস্থার নাম মন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মনও যাহা জীবাত্মাও তাহা। স্থানবিশেষে শাস্ত্রে লেখেন যে, পরমেশ্বর যেমন বাক্য মনের অগোচর সেইরূপ বুদ্ধিরও অগোচর। তাদৃশ স্থলে মন আর বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ এই যে,সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম বুদ্ধি। তন্মধ্যে অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি যে অহঙ্কার তাহা মনের অন্তর্গত এবং অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি যে চিত্ত তাহা বুদ্ধির অন্তর্গত। ফলতঃ সাধারণতঃ এ সমুদয়ই বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তিমাত্র এবং সেই মন আত্মার বিষয়-ব্যাপার-বিশিষ্ট অবস্থাগত উপাধিমাত্র। এ সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনে অতি বহুল বিচার আছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, মন মানবাত্মার অবস্থা-গত উপাধি-বিশেষ। মানব-আত্মা যখন বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণ, স্মরণ, মনন ইত্যাদি করে তখনই তাহারই নাম মন হয়। তথাপি ব্রহ্ম-বিষয়েও চিন্তা, স্মরণ, মনন করা কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ফলে সেপ্রকার স্মরণ, মনন বা চিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-লাভ হয় না, কেবল অনিত্য বস্তুর প্রকৃতি-চিন্তা এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের বাধক যে বিষয়াত্মিকা মতি তাহাই ক্রমে পরিত্যাগের উপায় হয়। অতএব তাদৃশ স্মরণ, মনন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অবস্থা নহে কিন্তু তাহা ব্রহ্ম-জ্ঞানে আরোহণের সোপানমাত্র। ব্রহ্মকে যখন জীবন্ত-ভাবে হৃদয়-ধামে লাভ হয় তখন জীবাত্মার বিষয়-সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়। সে সময়ে জীবাত্মা কেবল ব্রহ্মকেই উপভোগ করে। বিষয়-সম্বন্ধ-তিরোভাব জন্য তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ-বৃত্তি-প্রবাহ জীবাত্মাতে সামঞ্জসীভূত ও সংযত হইয়া যায়। তখন বাক্য নীরব হয়,

এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ হৃদয়ে সন্নিবেশিত হয়। সে সময়ে বাহ্য-জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, বিষয়-রাজ্য ও মনোরাজ্যে যেন এক নিশাকাল উপস্থিত হয়, তখন আর সকলেই নিদ্রা যায়। সেই অতি-ঘোরা রজনীতে আমারদের আত্মার কুটীরে, তাহার জনক জননী স্বরূপ পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ভক্তবৎসল ত্রিভুবন-নাথের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জীবাত্মার এই যে বিরল অবস্থা তাহাই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। এই অবস্থাই জীবাত্মার স্বকীয় নিশ্চিন্ত-অবস্থা; ঐ অবস্থার নাম প্রত্যয়, উহারই নাম বিশ্বাস, উহারই নাম ভগবৎপ্রেম, উহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান এবং ঐ অবস্থাতেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরকে বাক্য, মন, চক্ষু ইত্যাদি দ্বারা পাওয়া যায় না। তবে কিসের দ্বারা পাওয়া যায়? না "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে?" যাঁহারা বলেন তিনি আছেন তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করেন। তদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে? এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা জাগ্রত জ্ঞানের সহিত, অবিচলিত প্রেমের সহিত, দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সহিত দৃষ্টি করেন যে, তিনি আছেন তাঁহারাই তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত অস্তীতি-বাদী। তাঁহারাই সার্থক বলেন যে, "তিনি আছেন"। এই প্রকার ভাব ব্যতীত আর কি প্রকারে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে? অর্থাৎ আর কোন প্রকারেই পাওয়া যায় না।

৪। ব্রহ্ম আছেন এ কথা কেবল মুখে বলিলেই হয় না। তাহাকে শাস্ত্রে "বলা" বলেন না। যে ব্রহ্ম বাক্য, মন, চক্ষুরাদির অগোচর—অগম্য, "তিনি আছেন" এই কথা

বলিলেই যদি তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে আর তাঁহাকে বাক্যের অগোচররূপে কহা হইত না, কারণ "তিনি আছেন" এই কথা-মাত্র বলিয়া তাঁহাকে পাওয়া আর বাক্য দ্বারা তাঁহাকে পাঁওয়া একই কথা। মনের তো কথাই নাই। অতএব "যাঁহারা বলেন তিনি আছেন তাঁহারাই তাঁহাকে পান" এই শাস্ত্রীয় কথার মর্ম্মটি বাক্য, মন, চক্ষুরাদিগ্রাহ্য জ্ঞানের সহিত বি-প্রতিপত্তি-ভাবে একমাত্র জাগ্রত প্রত্যয়কে অথবা একমাত্র ব্যাকুলতা-যুক্ত প্রার্থনাকে, অথবা একমাত্র দৃঢ়তর প্রেম বা পরমাত্ম-জ্ঞানকে প্রতিপন্ন করিতেছে; কেবল বদন-নিঃসৃত-বাক্যকে প্রতিপন্ন করে না। উক্তপ্রকার প্রত্যয়, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রেম, পরমাত্ম-জ্ঞান, বা ব্যাকুলতা-যুক্ত প্রার্থনা— উহাকে যে নামই দেও, উহা জীবাত্মার ইন্দ্রিয়-চপলতা-বিহীন, বিষয়-চিন্তা-বিরহিত, মানস-চাঞ্চল্য-নির্ব্বাপিত-স্বরূপ অবস্থা-মাত্র। আজ কাল আমরা ঐ অবস্থাকেই অধিক সময়ে আত্মা ও হৃদয় বলি। উহাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি ও অনুভব করিয়া থাকে। উহার মধ্যে কিছুমাত্র বাহ্য-ভাব নাহি, কিছুমাত্র চপলতা নাহি।

৫। অতএব জীবাত্মার স্বরূপাবস্থাই ব্রহ্ম-লাভের উপযোগী। যত আমরা বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করত জীবাত্মার হোম-কুণ্ডে তাহাকে হবন করিতে পারিব, যত আমরা এ সংসারের মায়িক জ্ঞানকে জীবাত্মাতে হোম করিতে পারিব ততই আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব যে, "ব্রহ্ম আছেন" কেন না, ততই আমারদের হৃদয়ে তাঁহাকে আমরা বর্ত্তমান দেখিব। "ব্রহ্ম আছেন" এ কথা অনুমানে বলিলে সিদ্ধি-লাভ হয় না, তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেই সিদ্ধি-লাভ হয়। এক বার

যদি আমরা সেই ভুবনাধিপতি,পরা গতি,পিতা মাতাকে ঐরূপে দর্শন পাই তবে আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি আছেন। তাহার পর যদি তাঁহাকে আর না দেখিতে পাই তখনও তিনি আছেন এ বিশ্বাস নষ্ট হয় না। সেই বিশ্বাসের বলে তখন আবার ব্যাকুলতা-সহকারে তাঁহার তত্ত্ব করি। আবার তাঁহাকে লাভ করি। কিন্তু তাঁহাকে আমরা যতই শ্রদ্ধার সহিত বা যতই ভক্তির সহিত কেন দেখি না, তাঁহার পূর্ণ তত্ত্ব আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারি না। পূর্ণ তত্ত্ব লাভ করিতে না পারি, কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ-পুরুষরূপে—আমার-দের পিতা মাতা রূপে লাভ করিতে পারি। পিতা মাতার যে কত গুণ ও কত দয়া মমতা—তাহার পূর্ণতত্ত্ব আমরা লাভ করিতে অশক্ত কিন্তু তাঁহারদিগকে পূর্ণ পিতা মাতা রূপে আমরা লাভ করিয়া থাকি। পিতা মাতা আমারদের সম্বন্ধ ব্যতীত কত চিন্তা করেন, কত কার্য্য করেন। সে সকল ভাবে আমরা তাঁহারদিগকে পিতা মাতা রূপে গ্রহণ করি না; কেবল আমারদেরই সহিত তাঁহারদের যত টুকু হৃদয়-গত, মনোগত, শরীরগত যত্ন সেই টুকু দেখিয়াই আমরা তাঁহারদিগকে পূর্ণ পিতা মাতারূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা একাংশে আমারদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াও, আমরা সন্তান বলিয়া আমারদেরই দিকে মুখ্যভাবে মনোযোগ রাখেন; আমরাও তাঁহারদের অন্য ভাবের অনুসন্ধান না করিয়া যে মমতার স্রোত আমারদের দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহাই ধরিয়া তাঁহারদিগকে পূর্ণ পিতা মাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি এবং সেই ভাবে প্রাপ্তও হই। পরম পরাৎপর জগৎ-কারণ সমস্ত জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা ও রক্ষা-কর্ত্তা।

জগতের সহিত তাঁহার যত টুকু সম্বন্ধ আমরা তত টুকু ভাব অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে জগদীশ্বর কহি এবং তাহার মধ্যে আমার সহিত তাঁহার যত টুকু সম্বন্ধ আমি তাঁহাকে সেই পরিমাণে আমার পিতা বা অন্তরাত্মা বলিয়া উপলব্ধি করি। এই জগতের অতীত ভাগে বা আমার আত্মার বহির্দ্দেশে তাঁহার যে পরিমাণ সম্বন্ধ আছে তাহার পূর্ণতত্ত্ব আমি নাই পাই; তথাপি আমি ইহা জানি যে, তিনি আমার অন্তরাত্মা, পরম পিতা ও স্নেহময়ী জননী। এ ভাবে আমি পূর্ণরূপেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকি। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার স্বকীয় পূর্ণস্বরূপের তুলনায় তাঁহার জগদীয় সম্বন্ধ একাংশমাত্র কিন্তু আমরা তাঁহার সন্তান, এজন্য তাঁহার মুখ্য আনুরক্তি আমারদের প্রতি আছে। আমরাও তাঁহাকে প্রত্যেকে আপন আপন জনক জননী বলিয়া পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার সর্ব্বক্ষমতাকে আমরা না জানিয়াও ঐ পূর্ণতার মধ্যেই দৃষ্টি করি।

৬। কিন্তু পরমজ্ঞানী ঋষিগণ ব্রহ্মের শুদ্ধ একমাত্র অস্তিত্ব-জ্ঞানেই সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহাকে যে পরিমাণে আপনারদের সম্বন্ধ অনুসারে পাওয়া যায় তাহা তো তাঁহারা পাইয়াইছিলেন। তদতিরিক্ত পরমেশ্বরের এই জগতের সহিত যত দূর সম্বন্ধ তাহাও তাঁহারা অনেকদূর তত্ত্ব করিয়া সে ভাবেও তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই জগৎকে পরিত্যাগ করিয়াও কিয়ৎপরিমাণ তাঁহার তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছিলেন কিন্তু সে ভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না ইহাই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিয়াছেন—তিনি স্বরূপতঃ যে পূর্ণানন্দ তাহার সমুদয় পরিমাণ জীবের প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহার এক কণা মাত্র আনন্দকে সমুদয় জীব

উপভোগ করিতেছে। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" অতএব তত্ত্বভাবে পরমেশ্বরকে ঋষিগণ অতি উন্নত করিয়া দেখিতেন। বেদান্তসূত্রে আছে "বিকারাবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতিমাহ।" ৪র্থ অঃ ৪পাদ ১৯। অর্থাৎ পরমেশ্বর শুদ্ধ এই জগতের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহেন কিন্তু তিনি জগতের অতীতরূপে নিত্য, মুক্ত, বিশুদ্ধ স্বভাবেও স্থিতি করেন। গীতা-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে "একাংশেন স্থিতোজগৎ" আমি একাংশে এই জগতে ব্যাপিয়া আছি। পঞ্চদশী কহেন যে, নিরংশ, নির্ব্বিকার পরমেশ্বরেতে এইরূপ অংশ-আরোপ কেবল শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে। এই প্রকারে, ঋষিরা সেই পরমেশ্বরকে অস্তি-ভাবে লাভ করিয়া তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে জানিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন অনেক দূর উন্নত হইয়া অবশেষে কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আর জানা যায় না—তখন ইহা অবশ্যই কহিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাকে তত দূর জানিয়াছিলেন, যত দূর পরমেশ্বর মানবকে তাঁহাকে জানিবার শক্তি দিয়াছেন। এই হেতু তাঁহারা কহিয়াছেন যে,

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥"

তিনি আছেন এই বিশ্বাসেও তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যে "তিনি আছেন" যাঁহারা হৃদয়ে এই বিশ্বাস রাখেন, তাঁহারা সহজেই তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন এবং সেই তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। অতএব দেখ, কেমন আশ্চর্য্য ভাষায় ঋষিরা এই ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারদের জাগ্রত বিশ্বাস আমারদের সকলকে শিক্ষা দিতেছে এবং তাঁহারদের তত্ত্বভাব আমার-

দিগকে উন্নত তত্ত্বজ্ঞান ও উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনে উৎসাহিত করিতেছে।

৭। অতএব তর্কবিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ বিশ্বাসকে জাগ্রত কর। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রেম ও অনুরাগ দ্বারাই জানা যায় যে, পরমেশ্বর আছেন। আমি অন্ধ বিশ্বাসের কথা কহিতেছি না; কারণ অন্ধ বিশ্বাস আর মুখের কথা একই ব্যাপার। অতএব প্রেমযুক্ত বিশ্বাসকে জাগরিত করিতে হইবেক। যৎপরিমাণে নীরস তর্ক ও বিষয়ের অনুরাগ নিবৃত্তি হইবেক তৎপরিমাণে জীবাত্মা আপনার প্রকৃত বন্ধুর দিকে জাগ্রত হইয়া উঠিবেক। যৎপরিমাণে পরমেশ্বরের প্রতি আত্মা জাগ্রত হইবেক তৎপরিমাণে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেক এবং যৎপরিমাণে দেখিতে পাইবেক তৎপরিমাণে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেক ইতি।

সাম্বৎসরিক উৎসব।

সাম্বৎসরিক উৎসব।

দ্বারভাঙ্গা,

২১ মাঘ ১৭৯৪ শক।

বসন্ত-পঞ্চমী

চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব।

৬ সংখ্যা।

বসন্তপঞ্চমী

সায়ংকালের প্রথম বক্তৃতা।

ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান

যাহা পূর্ব্বকালে সরস্বতীকূলে প্রতিপালিত হয়

তৎপ্রতি সাধারণের চিত্তাকর্ষণ।

১। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে,—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেব-নদীর অর্থাৎ প্রশস্ত নদীর মধ্যস্থানে যে সকল দেব-নির্ম্মিত দেশ আছে তাহারদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। সেই দেশের যে আচার-ব্যবহার পরম্পরা-ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে তাহাই সর্ব্ববর্ণের সদাচার। উক্ত ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের পরেই কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও

মথুরা। এই সব দেশ ব্রহ্মর্ষি-দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সমুদয়-দেশ-সম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবেক।

অতি পূর্ব্বকালে ঐ সমস্ত দেশই বিদ্যার স্থান ছিল। বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র যাহা ভারতীয় অন্যান্য তাবৎ শাস্ত্রের প্রকাণ্ড কাণ্ডস্বরূপ এবং যাহা এখন সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানীদিগের নয়ন ও মন আকর্ষণ করিয়াছে তাহা ঐ সমুদয় দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ দেশের মধ্যে হিমাদ্রি-পর্ব্বত-নিঃসৃতা, সিন্ধু-সংঙ্গমিতা, মধুর-জলবিশিষ্টা, সুপ্রশস্ত ও অতিগভীর সরস্বতী নামে এক প্রবাহবতী নদী ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের পূর্ব্বেই ঐ নদীর শেষার্দ্ধ-ভাগ লুপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের তীর্থযাত্রা-পর্ব্বাধ্যায়ে সেই লুপ্ত ভাগ বিনশন-তীর্থ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। উহার প্রথমার্দ্ধভাগ ও তাহাতে সম্মিলিত দৃষদ্বতী নদী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে ঐ সরস্বতী নদীই ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি-দেশের প্রধান নদী ছিল। ঐ নদীর উভয় তীর দিয়া রাজর্ষি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের বাস ছিল। তথায় দেবর্ষিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ বন্দনা করিতেন এবং ব্রহ্মর্ষি-গণ ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। অতএব যে সরস্বতী নদীর উভয়কূলস্থ ভূভাগে জ্ঞান ধর্ম্মের এত আলোচনা হইত, যাহার পরিষ্কার জলে অবগাহন করত ঋষিরা দেহ শুদ্ধ করিতেন, যে সরস্বতী নদী দিয়া বণিকগণ রাজর্ষিগণের নিমিত্তে অসংখ্য অসংখ্য তরনী পূর্ণ করত ভক্ষ্য ভোজ্য ও ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য আহরণ করিত, যে সরস্বতী নদী বাণিজ্য-দ্রব্যের সহিত নানা দেশের জ্ঞান আনিয়া ঋষিদিগকে

প্রদান করিত, সেই সরস্বতী নদীকে বৈদিক ঋষিগণ কবিত্ব-রসে রসান্বিত হইয়া জ্ঞান ও বাক্যের ধন ও পবিত্রতার প্রেরয়ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথমানুবাকে, তৃতীয় সূক্তে, পঞ্চম ঋকে পাওয়া যাইতেছে। যথা—

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসু।"

শোধনকর্ত্রী, অন্নবিশিষ্টক্রিয়াবতী, কর্ম্ম-প্রাপ্য-ধনের প্রেরয়ত্রী সরস্বতী দাতব্য অন্নের সহিত আমারদিগের যজ্ঞকে কামনা করুন।——

অর্থাৎ যে সরস্বতীর জলে আমারদের দেহ পবিত্র হয়, যাঁহার তীরে আমারদের অন্নবিশিষ্ট ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়, যিনি নৌকাযোগে ধন আনিয়া দিলে আমারদের যজ্ঞাদি কর্ম্ম হয়, সেই সরস্বতী আমারদের যজ্ঞ কামনা করুন।

"মহোঽর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।"

নিজ প্রবাহ দ্বারা সরস্বতী নদী লোকদিগকে বহুজল জ্ঞাপন করেন। সরস্বতী নদী লোকদিগকে তাবৎ জ্ঞান প্রকাশ করেন।—

অর্থাৎ সরস্বতী নদী আপনার প্রবাহ, কি না, অত্যন্ত শ্রোত দেখাইয়া লোকদিগকে ইহাই জানান যে, আমাতে 'মহঃ অর্ণঃ' কি না, গভীর জল আছে। সরস্বতী নদীর উভয় তীরেই জ্ঞানের আলোচনা হয় এবং সরস্বতী নদী দিয়া নৌকাযোগে নানাদেশের সংবাদ আগমন করে, সুতরাং তিনি লোকদিগকে তাবৎ জ্ঞান প্রকাশ করেন। এই সকল নানা কারণে

সেই সরস্বতী নদী কালেতে পরম সুন্দরী দেবী রূপে কল্পিত হইয়া বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যা-স্থানের অধিষ্ঠাত্রী রূপে পূজনীয়া হইয়াছেন।

২। সে যাহাই হউক, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বিদ্যার আদর কখনই নষ্ট হয় না। তাহার সংশ্রবে স্থান পবিত্র হয়, গ্রন্থ পবিত্র হয়, মনুষ্য পবিত্র হয় এবং মানবের বাক্য ও ক্রিয়া পবিত্র হয়। যে স্থানে দশ দিন জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা হয়, মনের এমনি গতি যে, সে স্থানকে স্বভাবতঃ পুণ্য, পবিত্র বা তীর্থস্থান বলিয়া মনুষ্য কীর্ত্তন করেন। অতএব কবিত্ব-রসে রসান্বিত ভারত-ভূমির উর্ব্বরা কল্পনা-ক্ষেত্রে ঐ অবস্থা-বিশিষ্টা সরস্বতী নদী যে পূজিতা হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

৩। ঐ সরস্বতী-ধৌত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও তন্নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি-দেশ ও তদন্তঃপাতী নৈমিষারণ্য হইতেই সুধামাখা ব্রহ্ম-নাম প্রকাশ হইয়াছিল। ঐ সকল দেশের তপোবনে—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ বেদান্ত-বিজ্ঞান-যুক্ত-উপনিষৎস্বরূপ, ব্রহ্ম-জ্ঞান-স্বরূপ, ব্রহ্মানুষ্ঠান-স্বরূপ, আত্ম-তত্ত্ব-স্বরূপ, প্রেম-তত্ত্ব-স্বরূপ, মুক্তি-তত্ত্ব-স্বরূপ, যূথি জাতি, মল্লিকা, মালতী, অশোক, কিংশুক, চম্পক প্রভৃতি দেব-সেব্য সুরভি কুসুম সকল ভারতের বিগত বসন্ত ঋতুতে প্রস্ফুটিত হইয়া চারি দিক্ সৌরভে আমোদিত করিয়াছিল। ঐ স্থানেই শারীরক সূত্র দ্বারা ব্যাসদেব উক্ত কুসুমসমূহকে সুসজ্জিত করিয়া অক্ষয়-বেদান্ত-হার রচনা করিয়াছিলেন। এবং ঐ স্থান হইতেই কি গৃহস্থ কি বানপ্রস্থ সকলেরই নিমিত্তে পরম মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী নদীর উভয় তীর পুণ্যস্থান, বিদ্যা-

স্থান এবং সদাচারের স্থান বলিয়া চিরকাল স্মৃতিরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্য মনু আপনার ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সেই স্থানের অত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৪। যে ব্রহ্মবিদ্যার আকর-স্থান বলিয়া সরস্বতী-তীরবর্ত্তী দেশসমূহ এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যাহার সংসর্গে স্বরস্বতী নদী বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে পূর্ণ্যতীর্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, যে ব্রহ্মবিদ্যার আকর-স্থান বলিয়া সরস্বতী নদী পুরাণ-শাস্ত্রে সর্ব্ব-বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিমতী দেবীরূপে কল্পিতা হইয়া অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন, সেই ভারত-মৃত্তিকার মঙ্গল-প্রসূনস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার অনুরোধে স্বভাবতঃ আমারদের মন সেই প্রাচীন সরস্বতী-ধৌত পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থানের পক্ষ-পাতী হইতেছে। জগৎপতি 'একমেবাদ্বিতীয়ং', তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্', তিনি 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং', 'অমর্ত্ত্যোমর্ত্তে'— এই মৃত্যুর অধীন শরীরে অমৃত আত্মা রহিয়াছে। মানবের আত্মা অবিনাশী, ইহকালান্তে পরকাল আছে, 'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎ-কর্ষাৎ' ব্রহ্মদৃষ্টিই উৎকৃষ্ট, 'আসীনঃ সম্ভবাৎ' বসিয়া উপাসনা করিবেক, 'ধ্যানাচ্চ' ধ্যানযোগে উপাসনা করিবেক, 'অচলত্বং চাপেক্ষ্য' অচঞ্চলভাবে উপাসনা করিবেক, 'আবৃত্তিরসকৃদুপ দেশাৎ' পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ মনন করিবেক, 'অনা-বিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ' বালকের ন্যায় সরল হইবে, 'যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ', যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেখানে উপাসনা করিবেক, 'আপ্রায়াণাত্তত্রাপিহিদৃষ্টং' মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা করিবেক, 'মুক্তাঅপিহ্যেনমুপাসতে,' মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক। 'সংকল্পাদেবতু* তৎশ্রুতেঃ' বিনা ইন্দ্রিয় মুক্তেরা

* Power of will.

পরলোকে কেবল সঙ্কল্প * দ্বারাই ভোগাদি করেন, 'অনন্যাধিপতিঃ' তাঁহারদের আত্মা ব্যতীত শরীররূপ অধিপতি নাই, কেবল আত্মার সঙ্কল্পেই * তাঁহারদের সকল সিদ্ধ হয়, 'অভাবং বাদরিরাহহ্যেবং' বাদরি কহিয়াছেন যে, মুক্ত হইলে দেহ থাকে না, 'ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পমননাৎ' মুক্ত হইলেও দেহ থাকে এই জৈমিনির মত—যেহেতু বেদে বিকল্প আছে, 'উভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ' 'ঐ বিকল্প শ্রবণ দ্বারা বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে, মুক্ত হইলেই দেহ থাকে এবং না থাকে উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছামতে (সঙ্কল্প মতে *) হয়' †, 'তন্বভাবে সান্ধ্যবদুপপত্তেঃ' স্বপ্নে যেমন শরীর বিনা আত্মা বিষয়ভোগ করে, সেইমত শরীর না থাকিলেও আত্মা সঙ্কল্প * দ্বারা কামনা উপভোগ করেন। 'ভাবে জাগ্রদ্বৎ' কিন্তু ঐচ্ছিক দেহ প্রকাশ কালে জাগ্রতবৎ ভোগাদি করেন। 'সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' (ছাঃ) মৃত্যুর পর জ্ঞানীদিগের আত্মার সঙ্কল্পমাত্রে পিতৃলোক অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ ও অন্যান্য আত্মীয় মৃত ব্যক্তিরা উত্থান করেন, কি না, দেখা দেন। 'নস পুনরাবর্ত্ততে—ন স পুনরাবর্ত্ততে' তাঁহারদের কদাপি পুনর্জ্জন্ম হয় না—কদাপি পুনর্জ্জন্ম হয় না। 'কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণউপসংহারঃ' ব্রহ্মজ্ঞানে গৃহস্থের অধিকার আছে।

৫। এই সব মূল উপাদেয় ভাব অতি প্রাচীনকালে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ-স্বরূপ সরস্বতী-তীরে উৎপন্ন, প্রতিপালিত, বর্দ্ধিত, পরিশোভিত ও প্রচারিত হয়। সেই গুণে যেমন পৃথিবীর মধ্যে ভারত-ভূমি অন্যান্য দেশীয় জ্ঞানীগণের

* Power of will.

† বেদান্তসূত্র—রামমোহন রায়ের ভাষা ১৭৩৭ শক।

চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ ভারতবর্ষীয় অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ঐ সরস্বতী-তীর আমারদের মনকে অধিক আকর্ষণ করিতেছে। মানবের মনের এমনি ধর্ম্ম যে, যেখান হইতে প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় সহস্র সহস্র বৎসর ও শত শত ক্রোশ ব্যবধান থাকিলেও সে স্থানের প্রতি অনুরাগ জন্মে। অতএব উক্ত সরস্বতী-প্রবাহিত পুণ্য-ভূমির প্রতি ঐ কারণে আমারদের যেমন অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক, এই ভারতবর্ষের প্রতিও ঐ কারণে অন্যবর্ষীয় বহুজ্ঞানী লোকদিগের অনুরাগ সেইরূপ স্বাভাবিক। মানবাত্মার অমৃতত্ব ও পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্য উল্লেখ পূর্ব্বক অদ্য চতুঃষষ্ঠি বর্ষ গত হইল এক জন ব্রিটিস সেনাপতি লিখিয়া গিয়াছেন * "যে ভারতবর্ষ 'মানবের আত্মা অমর' এই উজ্জ্বল সিদ্ধান্তের আকর-স্থান, আমরা সেই ভারতের প্রতি নম্রতা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং তথা যে মহাত্মা ঐ পরম সত্য প্রকাশ

---

* "To India then as the source of this glorious doctrine let us return with becoming reverence, and pay due homage at the Shrine of that profound genius which unfolded this great truth (Immortality of the Soul) and divesting our minds of unworthy prejudices of education, ever hostile to improvements, let us contemplate with awe and with respect that remote period when this Sublime tenet with its manifold system of Theology and Sceince irradiated the Eastern Hemisphere and exhibited the pious Brahmin as the most enlightened of the Human race ; * * that remote period in which, our savage ancestors were perhaps, unconscious of a God ; and were doubtless, strangers to the glorious doctrine of the immortality of the soul, first revealed in Hindoostan." (Vindication of the Hindoos by a Bengal officer 1808 London.)

করিয়াছেন তাঁহার পবিত্র সমীপে উপযুক্ত পূজা প্রদান করি। যে বিদ্যাভিমান উন্নতির চির-বিরোধী—তাহা হইতে আমরা মনকে উদ্ধার করিয়া সেই প্রাচীন কালকে গম্ভীরভাবে ও ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করি—যে কালে উক্ত মহোচ্চ সিদ্ধান্ত নানা ধর্ম্ম-মত ও দর্শন-শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া পূর্ব্বদিকের গগণ-মণ্ডলকে আলোকিত করিয়াছিল এবং তৎকালীন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলকে পৃথিবীর সমগ্র মানব-সমাজের মধ্যে পরমোজ্জ্বল-জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল—যে কালে আমারদের অসভ্য বন্য পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য ছিলেন, এবং আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল মত সর্ব্ব-প্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তৎপক্ষে নিশ্চয়ই অজ্ঞ ছিলেন।" ইওরোপীয় আর এক মহাত্মা সর্ব্ব-বর্ষোত্তম-ভারত-প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া স্বরচিত গ্রন্থে এইরূপে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে,* "হে প্রাচীন ভারত-ভূমি! হে মানব-কুলের প্রথম-প্রতিপালিকে! তোমাকে আহ্বান করি, তোমাকে অভ্যর্থনা করি। হে শ্রদ্ধার পাত্রী! ও সুনিপুণ ধাত্রীস্বরূপে! শত শত বৎসরের বিজাতীয় আক্রমণও অদ্যাপি তোমাকে বিলুপ্ত করে নাই। হে ধর্ম্ম, প্রেম, কাব্য ও দর্শন-শাস্ত্রের গর্ভধারিণী! তোমাকে আহ্বান করি। ভবিষ্যতে আমারদের

---

* "Soil of ancient India, cradle of humanity hail! Hail venerable and efficient nurse whom centuries of * * * invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail fatherland of faith, of love, of poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our Western future."—Bible in India by M. Louis Jacolliot.—London. 1870

পশ্চিমরাজ্যে যেন তোমার প্রাচীন জ্ঞান-ধর্ম্ম পুনর্ব্বিকশিত হয়।”

৬°। এইরূপে ভারত-ভূমির প্রতি বিদেশীয় মহাত্মাদিগের পরম-গদ্‌গদ-ভাবযুক্ত মাতৃ-সম্বোধন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। অতএব যাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও পবিত্র প্রেম নর-লোকের কল্যাণার্থে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ সনাতন অনাদি দেবকে আমরা অগ্রে নমস্কার করি, পশ্চাৎ যে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র তাঁহার জ্ঞানকে প্রতিপাদন করে তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করি, যে সকল মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম স্বর্গীয় ব্রহ্মতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া ঐ সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া-ছেন তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করি, যে সরস্বতী তীরে সেই অতি-প্রাচীন কালে ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করি এবং যে ভারতবর্ষ ঐ সকল ব্যাপারের জন্য অতি পূর্ব্বকালে বিখ্যাত সেকেন্দর সাহার ও অধুনাতন ইওরোপীয় পণ্ডিতদিগের আদর লাভ করিয়াছেন এবং আমারদিগকে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আপনার সুপরীক্ষিত জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন আমরা তাঁহাকে মনের সঙ্গে প্রীতি করি।

৭। এইরূপে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণস্বরূপ, মূলবেদান্তস্বরূপ যে বেদ-শিরোভাগ উপনিষৎ-শাস্ত্র ও তদীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রস্বরূপ বেদান্তসূত্র একমাত্র নিরঞ্জন সনাতন পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদন করে তাহা অতি প্রাচীনকালে সরস্বতী-তীরে উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎকালে উক্ত নদীর উভয় কূলে তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ গৃহস্থ ঋষিগণের মধ্যে তদনুযায়ী আচরণ প্রচলিত ছিল। তাঁহারা অনেকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের পরিবর্ত্তে কেবল পরমজ্ঞানের

সাধনা করিতেন এবং শিষ্যদিগকে যত্নের সহিত তাহা শিক্ষা-দিতেন। পশ্চাৎকালে কতিপয় সুদৃঢ় উপাসক ঐ জ্ঞান সাধনার্থে এতই প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই পরিবর্ত্তন-শীল, শোকদুঃখময় ও অধ্যয়নের বাধক সংসারের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া সেই মধুর ব্রহ্মনাম বক্ষে করত দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত সূর্য্য দর্শন করিলে যেমন অপর সর্ব্ব পদার্থ তমসাচ্ছন্ন হয়; তাঁহারা সেই ধ্রুব,সত্য, জ্বলন্ত পরম দেবতাকে জ্ঞান-নেত্রে দর্শন করত এই সংসারকে তিমিরাবৃত দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিকই মানব ঈশ্বরকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলে কোথায় বা স্ত্রী পুত্র কোথায় বা সন্তান সন্ততির মায়া। সেই সকল পরম-শ্রদ্ধাস্পদ ও পরম-ভগবদ্ভক্ত উদাসীনগণ ঘোরতর-বিষয়োন্মত্তদিগের প্রতি এক প্রকার বিরক্ত হইয়াই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, গৃহস্থের বাটীতে ঐ পরমশাস্ত্র সকল পড়িতে নাই এবং গৃহস্থ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে। এই কারণে, যে ব্রহ্মোপাসনা ভারতীয় উপনিষৎ ও বেদান্তরূপ কল্প-বৃক্ষের ফলস্বরূপ এবং যাহা আদিতে গৃহস্থ-ঋষিগণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইত, তাহা কালক্রমে প্রায় সন্ন্যাসীগণেরই অধিকারস্থ হইল। মহাত্মা রামমোহন রায় শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন এই ভারত-কর্ম্ম-ভূমির প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাহাকে একপ্রকার জীবনশূন্য দেখিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে বেদ বেদান্ত ভারতবর্ষের মূল শাস্ত্র, তাহা পরিত্যাগ করিয়া লোকসকল অজ্ঞানের দাসত্বে বদ্ধ আছে এবং তাঁহার-দের প্রতিপালিত ধর্ম্ম-মত সকল কর্ণ-বিহীন তরীর ন্যায় অভি-নব বিপ্লাবক খৃষ্টান-ধর্ম্মের তর্ক-তরঙ্গে ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

বঙ্গদেশ যদি আর কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থিতি করিত তবে বোধ হয় এত দিন বঙ্গস্থান হইতে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-ব্যবহার অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়া তাহার অধিকাংশ লোক খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। তাদৃশ দুরবস্থার কালে মহাত্মা রামমোহন রায় অধীর না হইয়া কটি-বন্ধন পুরঃসর মহাবীরত্ব সহকারে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচীন কল্প-বৃক্ষকে সন্ন্যাসীদিগের অধিকার হইতে উৎপাটন করিয়া বৃটিস-জাতীয় জনতাকুল প্রধান রাজধানীর মধ্যস্থলে ব্রাহ্ম-সমাজ নাম দিয়া রোপণ করিলেন। সে সময়ে তৎপ্রতিকূলে কত আপত্তি, কত তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু রামমোহন রায়ের অসাধারণ বুদ্ধি ও চমৎকার শাস্ত্রীয় বিচারে সর্ব্বজাতীয় তার্কিকেরা অবশেষে পরাস্ত হইলেন। যদিও অদ্য কল্য নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নামে নানা ভাবের সভা বসিতেছে, কিন্তু সেই আদি-ব্রাহ্মসমাজ—সেই সরস্বতীকূল-প্রতিপালিত ও ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত জ্ঞানরত্নের পরম ভাণ্ডার এখনও এই মহাধর্ম্ম-বিপ্লব-সময়ে অচলপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে। তাহার যত্নে বেদান্ত-দর্শনান্তর্গত নানা গ্রন্থ, নানা উপনিষৎ, নানা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও যথার্থ মুক্তি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া এখন বঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে ধার্ম্মিক হিন্দুগণের আত্মা, মনঃ, গৃহ ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। মহা-বিপ্লবনকারী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এখনও সেই আদি-সমাজে প্রবেশ করিবার কোন ছিদ্র পায় নাই।

৮। এবম্প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতীর পবিত্র তীরে, ঋষিগণের আশ্রমোপবনে, যে ব্রহ্মোপাসনা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল—যাহা পশ্চাৎ ভারতবর্ষীয় মহা

মহা জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মী সকলেরই চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল—যাহা অবশেষে জনসমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া কেবল কতিপয় অনাশ্রমী সন্ন্যাসীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, অদ্য ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ অতীত হইল ভারতীয় জনসমাজের অনন্ত-কল্যাণ-কামনায় সেই স্বর্গীয় ব্রহ্মোপাসনা বর্ত্তমান-কালোচিতরূপে বঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা বর্ষে বর্ষে উহার সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষে পরমেশ্বরের নাম সংকীর্ত্তন করি এবং তাহার ভাগী হইবার নিমিত্তে আমারদের আত্মীয় কুটুম্বগণকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি।

৯। অদ্য আমরা ঐ স্বর্গীয় উপলক্ষে এই মহাসভা আহ্বান করিয়াছি। যিনি জগতের আদি কারণ, লোক-পাল, মহেশ্বর তিনি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তাঁহা হইতেই আমারদের জীবন, তিনিই আমারদের শেষ গতি এবং আমারদের সংসার-যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। আমরা তাঁহার সম্মুখে এই গার্হস্থ্য-মহাসভার মধ্যে ভারতীয় ব্রহ্মোপাসনা ও তৎপ্রতিপাদক মূল শাস্ত্রসমূহের অভ্যুদয়, তিরোভাব ও পুনরাবির্ভাবের সংক্ষেপ বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম। এখন প্রার্থনা করি সকলে সেই পূর্ব্বপুরুষগণের রক্ষিত শাস্ত্র ও তদনুমোদিত ব্রহ্মোপাসনার প্রতি মনের সহিত অনুরাগ প্রকাশ করুন এবং তাঁহারদের জীবন ধর্ম্মের আনন্দে অতিবাহিত হউক।

১০। আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি যে, আমারদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমারদের নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-ধর্ম্ম-সাধনোপযোগী যে সম্বল রাখিয়া গিয়াছেন তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে আমারদিগকে কখনই পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। আমরা শিল্প পদার্থ প্রভৃতি কতিপয়

বিদ্যা সম্বন্ধে অন্যের দ্বারস্থ হইতে পারি—কিন্তু ইহা আমারদের অল্প গৌরবের বিষয় নহে যে, ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার্থে যে কিছু উপকরণ প্রয়োজন তাহা আমরা ভারতবর্ষ হইতেই লাভ করিতেছি। ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অসীম ব্রহ্মজ্ঞানের সাগর-স্বরূপ।

১১। রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার নিমিত্তে নহে এবং হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের পত্তন করিবার উদ্দেশেও নহে। তৎকালীন সদাশয় ইওরোপীয়-গণের সংশ্রবে তাঁহার স্বীয় লৌকিক আচার আহত হইয়াছিল বলিয়া লোকে যতই মনে করুন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য এইমাত্র ছিল যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজের সাহায্যে ও আদর্শে হিন্দু-সন্তানগণ ক্রমে সেই প্রাচীন-কালীন ব্রহ্মজ্ঞানে ও যথার্থ ভগবৎ-ভক্তিতে পুষ্ট হইয়া উঠিবেন। এ যাবৎ-কালের যত্নে ও আদর্শে সেই মানব-হিতকর স্বর্গীয় উদ্দেশ্য যে, অনেকাংশে সফল হইয়াছে তাহা আমরা ব্রাহ্ম-নামধারী মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাই না; কেবল এইমাত্র বলিয়া পর্য্যাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি যে, উক্ত আদি-সমাজের অমূল্য সাহায্যে ও আদর্শে বর্ত্তমান কালে ঘোরতর ব্যভিচারের মধ্যে থাকিয়াও বঙ্গবাসী অনেক মহাত্মা উপনিষৎ, বেদান্ত, পঞ্চদশী, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি নানাবিধ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্রের পরিচয় পাইয়াছেন এবং অনেকেই তদ্দ্বারা মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তবে আক্ষেপের স্থল অবশ্যই আছে, কেন না, আলোচনার অভাবে এবং বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত উন্মত্ততা জন্য তাঁহারদের উন্নতি

বহুপরিমাণে স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। সেই স্বর্গীয় মহা-বিদ্যার আলোচনা এবং তদনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি ও ভগবানের আরাধনা যাহাতে দেশ মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হয় এই সময়ে তাহার প্রতি আমারদিগকে কটি-বন্ধন পুরঃসর মনোযোগী হইতে হইবেক এবং চতুর্দ্দিকে অভয়-দান পূর্ব্বক এই ঘোষণা দিতে হইবেক যে, আমরা হিন্দুসমাজ-চ্যুত করত কোন অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করি না।

১২। আমরা ভারতবাসী ঋষিগোত্রজ ও ঋষিপ্রবরজ হিন্দু-সন্তানগণকে কোন এক অভিনব ধর্ম্মে আহ্বান করিতেছি না এবং তাঁহারদিগকে শিষ্ট-পরম্পরা-প্রচলিত রীতি নীতির পরি-বর্ত্তন করিতেও অনুরোধ করি না। যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও ঋষি-সেব্য সুমিষ্ট শান্তিপ্রদ পরমোজ্জ্বল সভ্যতা অতিপূর্ব্ব-কালে সরস্বতীকূলে বিস্তারিত হইয়াছিল আমরা সেই ব্রহ্ম-জ্ঞান, সেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এবং সেই উন্নত সভ্যতার প্রতি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছি। ব্রহ্মর্ষিগণ সেই আদি-দেবকে যে প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান ও একনিষ্ঠা প্রীতির সহিত স্ব স্ব আত্মার মধ্যে ও সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতাধিবাস ও ভূতাতীত রূপে দর্শন করিতেন—যে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে আমরা সকলকে তাহাই অবগত হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিতেছি। যে অক্ষয় কল্পবৃক্ষ সরস্বতী-তীরে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীদিগকে মহাপুষ্টিকর অক্ষয় ফল প্রদান করত তাঁহাদের অক্ষয়-স্বর্গ-কামনা ও মুমুক্ষুত্ব পূর্ণ করিতে পারে—যদি আমরা তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিদেশ হইতে আনীত কোন ধর্ম্ম-ফলদ অথবা কাম-ফলদ তরুর অভিনব চাকচিক্য-দর্শনে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহাতে

হয়তো অভিলাষানুরূপ ছায়া লাভ করিব কিন্তু দুঃখের সহিত কহিতেছি যে, তাহাতে শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ অমৃত ফলের প্রত্যাশা নাই।

১৩। যদি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আমারদের শ্রদ্ধা থাকে, যদি ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আমারদের অনুরাগ হয়, যদি আমরা আমারদের মনকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া সেই বিষয়াতীত, ধর্ম্মাবহ, পরমেশ্বরের প্রতি অর্পণ করিতে পারি, যদি দিবানিশি তাঁহার দাস্য-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে পারি, তবেই জানিলাম যে, ভারতবর্ষের মধ্যে "আমারদের" বলিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। নচেৎ কালবশে ভারত-রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছে, হায়! এত কালের পর সেই সরস্বতী-কূল-পালিত ঋষি-সেব্য ভারতীয় ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের সেই দুরবস্থা হইতে চলিল ইতি।

সংখ্যা ৭

সায়ংকালের দ্বিতীয় বক্তৃতা ।

ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার অপসিদ্ধান্ত ।

১। "ব্রহ্মজ্ঞান" এই শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য এ পর্য্যন্ত অনেকেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন যে, ইহা ব্রহ্ম বিষয়ে কতিপয় শুষ্কজ্ঞান মাত্র। তাহাই মনে করিয়া অনেকে উহা উপার্জ্জনে অবহেলা করেন, অনেকে বা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণ নীরস তর্ক ও বিচার শিক্ষা করত আপনারদিগের শাস্ত্রীয় বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বৃথা অভিমান প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিরা যে, একপ্রকার নাস্তিক তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে এ প্রকার প্রেমশূন্য শুষ্ক জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান কহা যাইতে পারে না।

২। অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানকে গৃহস্থের পক্ষে অসাধ্য মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন যে, দেব দেবীর উপাসনার যত অঙ্গ আছে তাহা সাধন না করিলে এবং শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনে অলৌকিকরূপে কৃতকার্য্য না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানোপার্জ্জনের অধিকার জন্মে না। ঐরূপ বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ এমতও মনে করেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া সামান্য কথা নহে। তাহা হইতে হইলে পঙ্ক চন্দনে ও শীতোষ্ণে

সমান জ্ঞান করিতে হয় এবং আত্মীয় ও পর এরূপ ভেদ-জ্ঞান ত্যাগ করিতে হয়। গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করা যায় না এবং পুত্র ভার্য্যাতে যাহার মমতা-বুদ্ধি আছে, ধনোপার্জ্জনে যাহার মতি আছে, সুখ দুঃখ যাহার বোধ আছে এবং পান ভোজন দ্বারা যাহার জীবন ধারণ করিতে হয় তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান আলোচিত হইতে পারে না। কিন্তু আমারদের বিবেচনায় মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান কখন এত অসাধ্য নহে।

৩। আর কতিপয় ব্যক্তি আছেন; তাঁহারা ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়াই "হংস," "সোহহং," "তত্ত্বমসি," "সমাধি," "নির্ব্বাণ" প্রভৃতি কতিপয় শব্দ, এবং এমত কি ষট্‌চক্রভেদের অনুযায়ী কতিপয় শব্দ মাত্র অবলম্বন করিয়া অন্যের সহিত ঘোরতর বিতণ্ডা করেন। ফলে আপনারা ঐ সকল শব্দের পরিষ্কার ভাবার্থও জানেন না এবং তদনুযায়ী ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, প্রকার ও সীমাও অবগত নহেন। সুতরাং অন্যকে তাহা সন্তোষজনক রূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না। কেবল আপনারাই তাহা বিবৃত করিয়া আপনারদের জ্ঞানাভিমান চরিতার্থ করিয়া থাকেন। এইরূপ শুষ্ক ভাব প্রকৃত প্রস্তাবে একপ্রকার নাস্তিকতামাত্র; ভক্তি তাহার ত্রিসীমায় যায় না। এমত জ্ঞানকে কখনও ব্রহ্মজ্ঞান কহিতে পারি না।

৪। ঐ প্রকারের আর কতিপয় ব্যক্তি ব্রহ্মকে এমন উদাসীন বলিয়া ভাবেন যে, তাঁহাকে তাঁহারদের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা কহা যাইতে পারে না। তাঁহারদের মত প্রায় কতক পরিমাণে এই প্রকার—যে, এ জগৎ বাস্তবিক নাই। ইহা আকাশ-

কুসুম তুল্য মিথ্যা, কেবল ভ্রম-দৃশ্য-বিশেষ। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য কেবল কল্পনা মাত্র। স্বর্গ, নরক বা পরলোকের তো কথাই নাই, মনুষ্যের আত্মা পাশবদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু আমরা এ প্রকার অশাস্ত্রীয় মতকে কখনই ব্রহ্মজ্ঞান কহিতে পারি না।

৫। অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐ সকল নানা কারণে কেবল একটি অর্থশূন্য শব্দ মনে করেন। তাঁহারদের মতে "ব্রহ্মজ্ঞান" শব্দ উচ্চারণ করা বা ব্রহ্মজ্ঞান নাম দিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান আলোচনা করা কেবল বাতুলতামাত্র। তৎপরিবর্ত্তে সাংসারিক সুখের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলে এ প্রকার ঘোরতর সংসারী নাস্তিকদিগের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের বিষয় নহেন।

৬। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ঐ সকল অসঙ্গত সিদ্ধান্তের অনেক গুলি কারণ আছে। আত্মার মধ্যে——হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তাপ অনুভব * না করাই ঐ সকল অপসিদ্ধান্তের প্রথম কারণ। "ব্রহ্মজ্ঞান" এই জাগ্রত-ভাবার্থ-বিশিষ্ট শব্দ ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের ও ধর্ম্ম-মতসমূহের শিরোরত্ন। প্রধান প্রধান উপনিষৎপ্রণেতা ঋষিগণ যে সরল ও সহজ ভাবে এবং যেরূপ নির্ম্মল আত্মপ্রত্যয়ে ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে ও সমস্ত জগতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেন ও উপলব্ধি করিয়া যে অমৃতানন্দ উপভোগ করিতেন, "ব্রহ্মজ্ঞান" শব্দ সেই সহজ নির্ম্মল ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ পরম ভাবকে প্রতিপাদন করে। নতুবা উহা কোন প্রকার বোধাতীত ভাব ও কল্পিত ফলকে

* "অনুভব" শব্দের অর্থ হৃদয়ে স্পর্শ করা—"To feel."

জ্ঞাপন করে না। প্রধান প্রধান উপনিষৎশাস্ত্র-সমূহের মধ্যেই ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশক বচনসমূহ পাওয়া যায়। সেই সকল বচন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণের ব্রহ্ম-উপলব্ধির ও সহজ সদাচারণের অভিজ্ঞান স্বরূপ। প্রত্যেক মানবের আত্মার অভ্যন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের যে বীজাগ্নি নিহিত আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল বচনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলেই অনুভব করা যাইতে পারে যে, কত সহজে ঋষিরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতেন। যে কোন ব্যক্তি ঐ সকল বচনের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি আর কিছুতেই ব্রহ্মানুভবের পরম স্থান আপন আত্মাকে তাচ্ছল্য করিতে পারিবেন না। অতএব ঐ সকল উপনিষৎ-শাস্ত্রকে হৃদয়ের সঙ্গে ঐক্য করিয়া পাঠ না করাই ঐ সকল অপসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় কারণ।

৭। ব্রহ্মজ্ঞানের যাহা প্রকৃত মর্ম্ম তাহা সংক্ষেপে উপরেই বলা হইয়াছে। আদিতে কেবল প্রধান প্রধান উপনিষৎ-প্রকাশক ঋষিগণই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশক যত শ্রুতির বচন দৃষ্ট হয় তৎসমুদয় তাঁহারদিগেরই সরল হৃদয় হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ স্বভাবতঃ প্রকাশিত। উপনিষৎ-শাস্ত্রই মূল বেদান্ত ; এবং ব্যাসদেব-প্রণীত শারীরক সূত্র তাহার বিজ্ঞান-শাস্ত্রস্বরূপ। বেদান্ত-দর্শনান্তর্গত আর যত গ্রন্থ আছে তাহা উক্ত বেদান্তসূত্র ও উপনিষৎ শাস্ত্রের ব্যাখ্যামাত্র। সেই সকল ব্যাখ্যার অধিকাংশই অতি সূক্ষ্ম-বিচারে পরিপূর্ণ। যে আচার্য্যের যেমন বিদ্যা বুদ্ধি ও মনের ভাব তিনি সেইরূপ ব্যাখা করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উপনিষদের ও বেদান্তসূত্রের সরল ভাবকে অনেকেই রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা-পূর্ণ যত গ্রন্থ আছে

তৎসমূহের সাধারণ নাম বেদান্ত-দর্শন। কিন্তু উপনিষৎকে বেদান্ত-দর্শন কহা যায় না। তাহাকে বেদ অথবা মূল বেদান্ত কহা যাইতে পারে। অতএব উপনিষৎ ও ব্রহ্ম-সূত্র না পড়িয়া বা অচলা ভক্তি উপার্জ্জন না করিয়া যিনি বেদান্ত-দর্শনের কোন গ্রন্থ পড়েন, তিনি কেবল এক জন কু-তার্কিক হইয়া উঠেন। ফাকি ও মিথ্যা সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহার যত অনুরাগ থাকে—আপনার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশের দিকে তাঁহার যত দৃষ্টি থাকে—হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মকে অনুভব করার পক্ষে তাঁহার তত অনুরাগ থাকে না। উপনিষৎ ও ব্যাসসূত্র-প্রণীত সহজ উপায় ও ভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তদর্শনের পক্ষপাতী হইলেই নানা প্রকার অপসিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। উপরে যে কএক প্রকার অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছি এই তাহার তৃতীয় কারণ।

৮। অতঃপর, নানাবিধ পুরাণ ও তন্ত্র সকলও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকল প্রচুররূপেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে উপনিষদের বচন ও বেদান্ত-মীমাংসার সূত্রসমূহই প্রায় সকলের মূল ধন। কিন্তু ঐ উভয় শাস্ত্র যেরূপ সরল ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, উপরিউক্ত শাস্ত্র সকল সে সরলতা ও সহজ পথের সম্যক্ মর্য্যাদা রাখিতে পারেন নাই। তথাপি উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র-প্রণীত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপালক বচন ও ভাবসমূহ হইতে উক্ত পুরাণ, তন্ত্র ও গীতাসমুচ্চয় যে পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন তাহার নিকট বিজাতীয় ধর্ম্ম-পুস্তক সকল চিরকালের নিমিত্তে খদ্যোতিকার ন্যায় পরাভূত

হইয়া থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এ কথা কখনই বলিতে পারিনা যে, সরলতা বিষয়ে ঐ সকল শাস্ত্র উপনিষৎ ও বাদরায়ণ-প্রণীত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশক সূত্রসমূহের সমকক্ষ হইতে পারে। উক্ত শাস্ত্র সকলের মধ্যে আবার নানা প্রকারের কল্পনার সহিত এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন জন-সমাজের অবস্থানুযায়ী উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বচন সকল মিশ্রিত হইয়া আছে; সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত উপনিষৎ ও ব্যাসসূত্র পাঠ না করিয়া কেবল ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিতে গেলেই নানা অপসিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে যে কএক প্রকার অসঙ্গত সিদ্ধান্তের কথা কহিয়াছি এই তাহার চতুর্থ কারণ।

৯। উপরের উল্লিখিত শাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া যে সকল অলীক ও অসঙ্গত সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় তাহা বরং পদে আছে; কিন্তু একেবারে শাস্ত্র না দেখিয়া—কোন জ্ঞানাভিমানী বা সাধুতাভিমানী ব্যক্তির নিকট হইতে দুই চারিটি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধীয় শ্লোক শিক্ষা করিয়াই কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞান জানার এত অভিমান প্রকাশ করেন যে, তাঁহারদের অলৌকিক সিদ্ধান্ত সকল কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রকার মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রকাশ হইবার এই পঞ্চম কারণ।

১০। উপরি উক্ত পঞ্চপ্রকার অপসিদ্ধান্তের নিবারণ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। কিন্তু মুমুক্ষুত্ব ব্যতীত তাহা নিবারিত হয় না। কেবল পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিব বা পণ্ডিত হইব বলিয়া যাঁহারা বেদান্ত পড়িতে যান তাঁহারদের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যাঁহারা দোষ বহির্গত করণোদ্দেশে অথবা ইওরোপীয়দিগকে জ্ঞাপনার্থে অনুবাদ করার নিমিত্তে

তাহা পাঠ করেন, তাঁহারাও তাহার স্বর্গীয় মর্ম্ম লাভ করিতে পারেন না। "সারংন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ" তাঁহারা সার ভাগ পান না কেবল তাহা খরবৎ বহেন মাত্র। কিন্তু মুক্তি-ইচ্ছাপূর্ব্বক, সংযতচিত্ত হইয়া, ভক্তিভাবে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অনুরোধে যাঁহারা বেদান্ত পড়িতে অগ্রসর হন তাঁহারাই বেদান্ত পাঠ দ্বারা তাবৎ শাস্ত্রের মর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারক হয়েন। ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন বিষয়েরই রস পাওয়া যায় না। বেদান্তশাস্ত্রের আদেশ এই যে,

"অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো
দীপ্তশিরাজলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং
ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।"

(বেদান্তসার)

জন্ম মরণরূপ সংসারানলে সন্তপ্ত এই অধিকারী কোন প্রকার উপহার হস্তে করিয়া জ্বলিতমস্তক পুরুষের জলাশয়-গমনের ন্যায়, শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মস্তক জ্বলিতেছে—অতএব তাদৃশ ব্যক্তি যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে সরোবরাভিমুখে গমন করে, সংসারের প্রখর তাপে তাপিত হইয়া তদ্রূপ যে সাধক বিষয়াতীত অমরগণ-বাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ শীতল সলিলে গমন করেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন পূর্ব্বক ব্রহ্মকে নিশ্চিত দর্শন করেন। তাদৃশ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর নিকটে বেদান্ত-দর্শন স্বকীয় সকল তর্ক সংবৃত রাখিয়া স্পষ্টাক্ষরে সেই অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করেন। এমত ভাবে সাধনা করিতে পারিলে "ব্রহ্মজ্ঞান" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবেক। "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া" ব্রহ্মজ্ঞান তর্কের ফল নহে, কিন্তু অচলা ভক্তির অক্ষয় অমৃত ফল।

১১। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্ত-সূত্রের এই কএকটি সার সার কথায় প্রকাশ পাইতেছে। যথা—

১। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এক যে পরমেশ্বর আছেন তাহা সামান্যরূপে ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন, কিন্তু 'নতদ্বিশেষংপ্রতিবিপ্রতিপত্তেঃ' বিশেষরূপে তাঁহাকে সহজে জানা যায় না, এজন্য যাঁহারদের বিবেক, ফলভোগ-বিরাগ, সততা ও মুক্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাঁহারা প্রচলিত দেব দেবীর উপাসনাদি কর্ম্ম না করিয়াও 'তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব' ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে তাঁহারদের অধিকার আছে।

২। অতঃপর, ব্রহ্ম যে আছেন তাহা কিরূপে জানা যায় তাহা কহিতেছেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যিনি এই সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা তিনি ব্রহ্ম। "বিশ্বের জন্ম,স্থিতি, ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি—যে হেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে।"* 'বিচারপূর্ব্বক এই বাক্যার্থকে হৃদয়ঙ্গম করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়' অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গের আলোচনা করিলেই ব্রহ্ম আছেন ইহা নিশ্চয় জানা যায়। 'বেদান্তবাক্যার্থদার্ঢ্য' বেদান্তের এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন তাহা "দার্ঢ্য," কি না, নিশ্চয়। ব্রহ্ম আছেন তাহা সত্য—তাহাতে লোকের 'দার্ঢ্য' আছে, কি না, বিশ্বাস আছে। অতএব বিশ্বাস ও তদবিরোধী যুক্তি ও অনুমান সকলও ব্রহ্ম থাকার প্রমাণ। "ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ন্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কেবল শ্রুতিমাত্র প্রমাণ নহে, কিন্তু

---

* রামমোহন রায়—বেদান্ত-ভাষা ১৭৩৭ শক।

শ্রুতি ও যুক্তি উভয়ই প্রমাণ; যেহেতু নিত্যবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অনুভবেতেই পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু কর্ত্তব্য বিষয়েতে অনুভব অপেক্ষিত নহে, শ্রুতিমাত্রই প্রমাণ।" শ্রুতি-শাস্ত্রে যে সকল যজ্ঞাদি করার ব্যবস্থা আছে তাহার অনুষ্ঠানই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। সেই সকল কর্ম্মের প্রমাণ শ্রুতিই; শ্রুতিভিন্ন অন্য কিছু নহে। সে সকল কর্ম্ম করিতে হইলে মানবকে শ্রুতির দাস হইতে হইবেক, তাহাতে আর নিজের কোন অনুভব অর্থাৎ বিচার বা যুক্তি চলে না; সুতরাং উক্ত হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে "অনুভব" অপেক্ষিত নহে। কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় শ্রুতি ও যুক্তি উভয়ই প্রমাণ। শ্রুতি এইজন্য প্রমাণ যে, আদি কাল হইতে মনুষ্য ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশদ্বারা ব্রহ্ম থাকা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, শ্রুতি সেই সত্যের পরিচয় দিতেছেন। আর যুক্তি, (এখানে বেদান্তে যুক্তি, অনুভব, অনুমান ও দার্ঢ্য, কি না, বিশ্বাস সকল শব্দই একই তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে) এই জন্য প্রমাণ যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম আছেন উল্লেখ থাকাতেই যে, সাধকের তাহাতে বিশ্বাস হইবে এমত নহে, সে সত্যটি সাধকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাহি; এই জন্য বেদান্ত কহেন যে, "নিত্যবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান অনুভবেতেই পর্য্যবসিত হয়" অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য—তাঁহার জ্ঞান হৃদয়ে প্রবেশ করা চাহি। হৃদয়ে প্রবেশার্থে যে সকল যুক্তি, অনুভব, অনুমান প্রভৃতি প্রয়োজন তাহাও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ। অতঃপর, ব্রহ্মের অস্তিত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিলে যে অচল বিশ্বাস জন্মে তাহাও প্রমাণ; তাহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। এতাবতা, ব্রহ্ম আছেন, তদ্বিষয়ে জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ এক

প্রমাণ; শ্রুতি এক প্রমাণ; যুক্তি, অনুভব অথবা প্রত্যয় এক প্রমাণ—এই তিন প্রমাণ। কিন্তু যে ব্যক্তি জগৎকার্য্যের আলোচনা, বিশ্বাস, অনুভব ও যুক্তি বিনা কেবল শ্রুতির দাস হন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না।

১২। অর্থাৎ কেবল বেদ বেদান্ত পড়িলেই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় এমত নহে। সৃষ্টির প্রকৃতি আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহারে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন, তাহাতে ব্রহ্মসত্তার যে জ্ঞান হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়স্থিত অনুভব শক্তিও সেই ব্রহ্মজ্ঞানটি পাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে উৎসুক হইয়া থাকায় ঐ অনুভব-শক্তিও পরমেশ্বর থাকার এক প্রমাণ হইল। জগদালোচনা ও অনুভব এ উভয়ই পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে; কিন্তু শ্রুতিপাঠ না করিলে ঐ দ্বিবিধ প্রমাণ উপযুক্তমত বল লাভ করিতে পারে না; কেন না,তুমি যেরূপে জগতের সৃষ্টি,স্থিতি, নাশের আলোচনা দ্বারা ও অনুভবের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেছ, সেই রূপ করিয়া অতিপূর্ব্বকাল হইতে শত শত সাধক ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন,—এই সত্যটি তুমি যখন মানব-প্রকৃতির চিত্রপটস্বরূপ শ্রুতিশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিবে তখন তুমি জানিবে যে, তুমি একা নহ, কিন্তু অনেক সাধক তোমার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তোমার বিশ্বাস আরো উজ্জ্বল হইবে,আরো বল লাভ করিবে; কেন না, তুমি তখন জানিবে যে, চিরকাল ধরিয়া মানব-প্রকৃতি ব্রহ্ম-লাভার্থে ব্যাকুল হইয়া আসিতেছে এবং সেই অনাদি পুরুষকে আপন আপন হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা হৃদয়ঙ্গমদ্বারা দর্শন করিয়াছেন। তিনি এইরূপে চিরকালই নিজভক্তের কামনা পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। তুমি সকল কথার এই সার মর্ম্ম

তখন গ্রহণ করিতে পারিবে যে,মানবের হৃদয়ই ব্রহ্মকে চাহে, জগৎ ও শ্রুতি তাহার পোষকতা করে।

১৩। বেদান্ত-মতে হৃদয়, জগৎ ও শ্রুতি এ তিনই পরব্রহ্মের অস্তিত্বের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুভব ও ব্যাকুলতা প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপারের অভাবে জগৎ ও শ্রুতি নিষ্ফল; জগতের ভাব স্মরণ করা ব্যতীত শ্রুতি ও হৃদয় পঙ্গু। এবং শ্রুতি পরিত্যাগ করিলে হৃদয় ও জগদুৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান বল লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান তর্কের ফল নহে। হৃদয়ের সহিত জগৎ ও শ্রুতি ও নিজের অনুভব-শক্তির আলোচনায় উহা উৎপন্ন হয়, সুতরাং ভক্তিযুক্ত আলোচনাই বিশেষরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার উপায়।

১৪। এই দুইটি বেদান্ত-বচন হইতে জানা যাইতেছে যে,যজ্ঞাদি কর্ম্ম (অদ্য কল্য দেবদেবীর উপাসনা) ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উৎপত্তির কারণ নহে। বেদান্তের মর্ম্ম এই যে, যদি বেদান্ত অধ্যয়ন থাকে, তবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করিলেও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হয়। কিন্তু বেদান্ত-পাঠের অনন্তরই যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হয় এমত নহে (কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় শ্রুতিমাত্র প্রমাণ নহে) কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্য ও শম দমাদির সাধন হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়— ফলে একমাত্র শ্রুতি বা বেদান্ত পাঠ দ্বারা তাহা হয় না। যখন শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্যের উপরিই বিশেষরূপে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দণ্ডায়মান হইল; তখন দেখাই যাইতেছে যে,মনের অনুরাগই মূল—যাহা শম, দম, বিবেকাদির নামান্তরমাত্র— জ্বলিতমস্তকে ব্রহ্মরূপ সলিলের কামনাই মূল যাহার সঙ্গে

সঙ্গে শম দমাদি ও মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি সব রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ না বুঝিয়া যাঁহারা তাহাকে শুষ্ক-জ্ঞান মনে করেন তাঁহারদের ভ্রম। এবং যাঁহারা তাহার পূর্ব্বে অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও কোন প্রকার অলৌকিক শম দমাদির সাধন প্রয়োজন বলেন তাঁহারদেরও ভ্রম। যজ্ঞ ও দেব দেবীর পূজা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ নহে। শম দমাদি ভক্তির আনুষঙ্গিক। সুতরাং ভক্তিই মূল। পরন্তু শ্রুতি অথবা শাস্ত্রও একমাত্র মূল নহে।

১৫। এতদূরে ঐ দুইটি বেদান্তসূত্র হইতে আমরা এই বুঝিলাম যে, পরমেশ্বর আছেন এ মূল বোধ সকলেরই আছে, কিন্তু তাঁহার প্রাপ্তি জন্য হৃদয়-মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মিলেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, জগৎ ও শাস্ত্র তাহার সাহায্য করে। দেব-দেবীর পূজার সঙ্গে সে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাহি, কিন্তু শম,দম,বিবেক,বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব তাহার অব্যর্থ আনুষঙ্গিক। শম দমাদি যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আনুষঙ্গিক, তদ্বিষয়ে বেদান্ত কহেন যে, "যথা রাজাসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো-গমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ।" যেমন রাজা গমন করিতেছেন বলিলে রাজার পার্ষদদিগেরও গমন বুঝায় শম দমাদি তদ্রূপ ব্যাকুলতাযুক্ত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গী। সেই শম দমাদির পৃথক্ সাধন নাহি, সাধন ব্রহ্মেরই—অতএব ব্রহ্ম-লাভার্থে প্রাণ কান্দিয়া উঠিলেই শম দমাদি আসিয়া পুরুষকে আশ্রয় করে। ঐ ক্রন্দন, ঐ মস্তকের জ্বালা, ঐ ব্যাকুলতা, ঐ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সজ্ঞান-ভক্তির নামান্তর মাত্র। এইজন্য জ্ঞানী বৈষ্ণবেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, "সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী"। ভক্তি-বিহীন উপাসনা অতি সামান্য উপাসনা। ভক্তিহীন

ব্রহ্ম-নাম হৃদয়কে আঘাত করে না। যে ভক্তিতে হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটিত হয় তাহার দ্বারাই প্রকৃত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ও প্রকৃত ভগবদারাধনা হইয়া থাকে। বেদান্তে উক্ত আছে যে,

"নসামান্যাদপ্যুপলব্ধেঃ মৃত্যুবন্নহিলোকাপত্তিঃ।"

৩অঃ ৩পাঃ ৫২।

সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না—যেহেতু সে উপাসনায় জ্ঞানও লাভ হয় না, ব্রহ্মও লাভ হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতিতে তাহার প্রমাণ আছে। যেমন মৃদু আঘাতে মর্ম্মভেদ হয় না, মৃত্যুও হয় না; কিন্তু দৃঢ় আঘাতে মর্ম্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয়। কেবল ভক্তি-যোগেই সেই দৃঢ় উপাসনা হইতে পারে—অতএব ভক্তির দাসী মুক্তি। বেদান্ত আরো কহেন যে, "পরেণচ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ।" ঐ, ঐ, ৫৩। পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি আর 'তাদ্বিধ্যং' অর্থাৎ প্রীতির অনুকূল ব্যাপার এই দুই মুখ্য উপাসনা। অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভগবানের প্রিয় কার্য্যই সার সাধন। "এক আত্মনঃ শরীরে-ভাবাৎ" ঐ, ঐ, ৫৪। আমারদের জীবাত্মা হইতে ঈশ্বর মুখ্যপ্রিয়, অতএব অতি স্নেহ দ্বারা তেঁহ উপাস্য হয়েন—যে হেতু তিনি আমারদের শরীরে ও আত্মায় পরমোপকারীরূপে অবস্থিতি করেন। "তদেতৎ প্রিয়ংপুত্রাৎ" শ্রুতিঃ। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়। অতএব আমরা পুত্রকে যে প্রকার স্নেহ করি তদপেক্ষা অধিক স্নেহে তাঁহাকে আদর করিতে হইবেক। "ব্যতিরেকস্তুতদ্ভাবাভাবিতত্বান্নতূপলব্ধিবৎ" ঐ, ঐ, ৫৫। জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্নই হয়েন—অর্থাৎ পরমেশ্বর নিজে

জীব নহেন। পরমেশ্বর আর জীবে ভেদ আছে। পরমেশ্বর আছেন বলিয়াই জীব অবস্থিতি করিতেছে। পরমেশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু কেবল উত্তম ভক্তি-যুক্ত উপলব্ধি-জ্ঞান দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন। তাদৃশ জ্ঞানে দৃষ্ট হইলে তিনি জীবকে নিস্তার করেন। কিন্তু যদিও উপাসনার নিমিত্তে ভক্তিরই প্রাধান্য। তথাপি এ কথা বলিতেই হইবেক যে, শ্রুতি-পাঠ ও জগদালোচনা সেই শ্রদ্ধারূপ হোম-কুণ্ডস্থ অগ্নিকে চিরপ্রজ্বলিত রাখিবার নিমিত্তে অনবরতই ইন্ধন যোগাইয়া দিবেক। আর যদিও শম দমাদি ভক্তির অনুষঙ্গী—তথাপি বেদান্তে কহেন যে,

"শমদমাদ্যুপেতঃস্যাৎ তথাপিতদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাৎ"

ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক—তাচ্ছিল্য করিবেক না।

১৬। অতঃপর, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন যে গৃহস্থের প্রতি অসম্ভব মনে করেন তাহাও ভ্রম। কেন না, বেদান্তে উক্ত আছে যে, "কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ" (৪৮। ৪। ৩) যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরো তাহাতে অধিকার আছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক; যেহেতু বেদে কহেন শ্রদ্ধাধিক্য হইলে সকল উত্তম গৃহস্থ দেবতা ও যতিতুল্য হয়েন—"শ্রদ্ধাধিক্যাত্তু কৃৎস্নাহ্বেব গৃহিণো-দেবাঃ কৃৎস্নাহ্বেব যতয়ঃ।" ছা। আর একটি আপত্তি এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইলে পঙ্কচন্দনে ও শীতোষ্ণে সমান জ্ঞান করিতে হয়। এ আপত্তিও অযুক্ত। মহাত্মা রামমোহন

রায় ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, "তাঁহারা কি প্রমাণে এ বাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই; যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে, নারদ, জনক, সনৎকুমারাদি; শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহাঁরা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্যকর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কিরূপে" ঐ কথা স্বীকার করা যায়*।

১৭। অতঃপর, "তত্ত্বমসি," "হংস," সোঽহং," "নির্ব্বাণ" প্রভৃতি শব্দ সকলের যে কিছু ভাল অর্থ আছে তাহাও একমাত্র অচলা সজ্ঞান ভক্তির মধ্যগত। এস্থলে তাহার সারার্থ দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

১৮। যাঁহারা জগৎ মিথ্যা বলেন তাঁহারদের সে কথার যদি কোন গূঢ় অর্থ থাকে তাহা তাঁহারা আপনারাই জানেন না; কারণ অত্যন্ত ঈশ্বর-প্রেম উৎপন্ন হইলে সেই প্রেমযুক্ত ধ্যানের অবস্থায় তেমন বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎ মিথ্যা নহে। ঈশ্বর যেমন সৎ জগতও তাঁহার আশ্রয়ে তেমনি সৎ। যদি কখন পরমেশ্বর এই জগৎ সংহার করেন তখন ইহা মিথ্যা হইতে পারে; ফলে তাহার সহিত ইহার বর্ত্তমান সত্যতার কোন বিরোধ নাই। অপর, বেদান্তেই কহেন যে,—"অসদিতিচেন্ন প্রতিষেধ-মাত্রত্বাৎ" সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল—সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে। যে হেতু সতের 'প্রতিষেধ,' কি না, বিপরীত অসৎ। সৎ শব্দে সত্য বা

* রামমোহন রায় বেদান্তের ভূমিকায়।—শকাব্দা ১৭৩৭।

অস্তিত্ব। অসৎ শব্দে মিথ্যা বা অনস্তিত্ব। সুতরাং সৃষ্টির পর যদি জগতের অস্তিত্বের অভাব হয় তবে কি প্রকারে জগৎ অস্তিত্ব লাভ করিল? সুতরাং জগৎ যখন আছে তখন উহা সত্য। যখন ছিল না তখন তো কাজে কাজেই মিথ্যা ছিল। অতএব এই কথা বলিতে হইবে যে, জগদীশ্বর অসদবস্থা হইতে জগৎকে সদবস্থায় আনিয়াছেন। অর্থাৎ কিছুই ছিল না—তিনি আলোচনা করিলেন আর এই জগৎ উৎপন্ন হইল। এতাবতা, সত্য-জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা তাহাকে ভ্রম-দৃশ্য বলা অযুক্ত। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ। তিনি যাহা করেন তাহা মিথ্যা করেন না। তাঁহার কীর্ত্তি ঐন্দ্রজালিক নহে। এখন এই জগৎ যেমন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে ইহাকে মিথ্যা বলা তো বেদান্তের অভিপ্রায়ই নহে; আবার সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের যে অসদবস্থা উপরে উল্লিখিত হইল তাহাকেও বেদান্ত অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সৎ বলিয়া অনুমান করেন। "সত্ত্বচ্চাবরস্য" ২। ১। ১৬। অবর অর্থাৎ জগৎ-রূপ-কার্য্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে ছিল। সৃষ্ট হইয়াও ব্রহ্মেরই মধ্যে আছে। যদিও বেদে স্থানে স্থানে কহেন যে,সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল অর্থাৎ ছিল না; কিন্তু বেদান্ত তাহার এইরূপ অর্থ করেন যে, "অসদ্ব্যপদেশাদিতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ" ২।১।১৭ অর্থাৎ বেদে কহেন বটে যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে জগৎ ছিল না, কিন্তু সেরূপ কথনের তাৎপর্য্য অন্যরূপে বুঝিতে হইবে। যথা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ নাম রূপে প্রকাশ ছিল না,ফলে সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মের শক্তিরূপ কারণেতে সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল—এই তাৎপর্য্য মতান্তরে বাক্য-শেষে ঐ বেদই স্বীকার করিয়াছেন। এই

দুইটি বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য এখন এইরূপে অবধারণ করা যাউক যে, এখন জগৎ যাহা আছে এবং ভবিষ্যতে ইহাতে যে কিছু পরিবর্ত্তন হইবে সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই সমগ্র ভাব অব্যক্ত-ভাবে* জগদীশ্বরের শক্তি-কোষে বর্ত্তমান ছিল। তখন যে, তাহা তদ্রূপ সূক্ষ্ম ও অব্যক্তভাবে ছিল তাহা মিথ্যা নহে—সত্য সত্যই ছিল। কারণ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তির মধ্যে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না, ভ্রমও থাকিতে পারে না। সুতরাং সে ভাবে তখনও জগৎ সত্য ছিল আর এখন তো প্রকশ্যরূপে সত্য আছেই। বেদান্তের এই তাৎপর্য্য কেমন মনোহর! এমন তাৎপর্য্য থাকিতেও যাঁহারা জগৎকে বাস্তবিক মিথ্যা বলেন তাঁহারদের অত্যন্ত ভ্রম। এই কথার আনুষঙ্গিক আর একটি কথাও বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বকার জগতের সেই অবস্থাকে অসৎই বল আর সৎই বল আর এখনকার জগতের যে সদবস্থা দেখিতেছ এই সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে পরমেশ্বর স্বয়ং জগদীয় স্বরূপ হইতে ভিন্ন স্বরূপেই অবস্থিতি করিতেছেন। বহু বিচারের পর বেদান্ত অবশেষে ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, তিনি আপন স্বরূপকে কখনও জগৎরূপে পরিণত করেন নাই; কিন্তু তিনি আলোচনা করিলেন আর তাঁহার শক্তি হইতেই এই আশ্চর্য্য রচিত অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইল।

১৯। অতএব জগৎ কখনও ভ্রম-দৃশ্য নহে, কখনও মিথ্যা নহে এবং স্বয়ং পরমেশ্বরও কখনও জগৎ বা জীব হন নাই।

---

* আমার সৃষ্টিগ্রন্থে অব্যক্ত প্রকরণ পড়হ।

২০। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান যেরূপে উপার্জ্জিত হয় তাহা বেদান্তের এই কএকটি কথাতেই পাওয়া যাইতেছে। তার্কিকগণের আর যত আপত্তি আছে ভরসা করি তাহার খণ্ডন উহাতেই হইয়াছে। মানবের চৈতন্য যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে এবং পাপ পুন্য, পরলোক কখনও মিথ্যা নহে। যদি ও সকল মিথ্যা হইত তবে মৃত্যুর পর দেহ থাকে কি না ও কিরূপ আনন্দ সম্ভোগ হয় তদ্বিষয়ে ভূরি বিচারান্তে বেদান্তে কখন এরূপ সিদ্ধান্ত হইত না যে, মৃত্যুর পর মুক্ত ব্যক্তিরা দেহ না থাকিলেও কেবল সঙ্কল্পদ্বারা ভোগাদি করেন। "সঙ্কল্পাদেবতু তৎশ্রুতেঃ। অতএব চানন্যাধিপতিঃ।" মুক্তেরা ব্রহ্ম হইয়া যান না, কিন্তু আপনারদের ইচ্ছার যোগে ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি উপভোগ করেন। তাঁহারদের শরীর থাকে না। কিন্তু তথাপি যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন তবে শরীর দেখাইতে পারেন এবং সংকল্প দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয়। "উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ" বেদান্তে লেখেন যে, মুক্ত হইলে (পরলোকে) দেহ থাকা না থাকা উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছামতে হয়। ইহা বাদরায়ণের মত*।

২১। অতএব জীবাত্মা কখনও ব্রহ্ম নহে। পাপ পুণ্য মিথ্যা নহে, পরলোক কল্পিত নহে।

২২। এতাবতা, আমরা সহজ জ্ঞান, আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ যুক্তি হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে যত সত্য পাইতেছি, বেদান্তদর্শন সুন্দর বিচার ও মীমাংসার সহিত তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা আমারদের মনের সহিত ঐক্য হয় না

---

* আমার সৃষ্টিগ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করহ।

তাহা কখনও সত্যধর্ম্ম নহে। এইজন্যই বেদান্তের এত গৌরব। কিন্তু বেদান্তের প্রকৃত অভিপ্রায়কে পূর্ব্বকালীন নানা আচার্য্যের নানা মত হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা একটু ভক্তির কর্ম্ম; ব্রহ্মজ্ঞানার্জ্জনে চিত্ত একটু ব্যাকুল না হইলে, সংসারের অপর কর্ম্ম সকল হইতে একটু অবসর করিয়া না লইতে পারিলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোচনা হয় না। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক এবং বিশেষরূপে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলেই সকল কথার মীমাংসা লাভ করিবে।

সংখ্যা ৮।

ষষ্ঠী

প্রাতঃকালের প্রথম বক্তৃতা।

ইন্দ্রিয় দমন ও ভগবৎসেবা।

১। শ্রেয়োভিলাষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদাই আপন আপন চরিত্র শোধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। স্বয়ং পবিত্র না হইলে পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের সেবায় অধিকার হয় না। আমরা যদি যত্ন করি তবে আমরা অবশ্যই নিজ নিজ স্বভাবকে পবিত্র করিতে পারি, কেন না, পরমকারুণিক বিশ্বপাতা আমারদিগকে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির ন্যায় অথবা বৃক্ষ লতা প্রভৃতির ন্যায় কর্ত্তৃত্বহীন জড়-নিয়মের বা অজ্ঞান প্রকৃতির অধীন করিয়া দেন নাই, অথবা পশ্বাদি নিকৃষ্ট জীবগণের ন্যায়ও আমারদিগকে উন্নতি-বিহীন সংস্কার দ্বারাও আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি আমারদিগকে হিতাহিত জ্ঞানযুক্ত কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন এবং সেই কর্ত্তৃত্বই আমারদিগকে সর্ব্ব জীবের উপরি উচ্চাসন ও স্বর্গীয় শ্রী প্রদান করিয়াছে। এমন উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম লাভ করিয়া যিনি আপনাকে পবিত্র ও ভবতারণের সেবায় নিযুক্ত না করেন তাঁহার জন্ম বৃথা। মানব যত্ন ও অধ্যবসায় বলে এই জগতে

কত কত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি করিয়াছেন। স্বীয় শরীরকে সুশোভিত ও সুরক্ষিত করিবার নিমিত্তে কত বিবিধপ্রকার বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আপনার বাসস্থানকে কত অপূর্ব্ব অট্টালিকা উদ্যান ও সরোবরের দ্বারা শোভিত করিয়াছেন এবং গমনাগমনের নিমিত্তে কেমন চমৎকার বাষ্পীয় রথ ও পোত প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারে অশ্ব, রথ, গজ ও দাস দাসীগণ তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে এবং তিনি যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা রাশি রাশি অর্থ ও ভক্ষ্য পেয়ের উপকরণ সকল আহরণ করত পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন; কিন্তু যে সনাতন পুরুষ সকলের সার তাঁহাকে তিনি ভুলিয়া রহিয়াছেন; আপনার দুর্লভ জন্মকে যে, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে এ কথা তাঁহার ভ্রমেও মনে পড়ে না। কি আশ্চর্য্য মোহ, কি আশ্চর্য্য মায়া!

২। হে মানব! তুমি কত কাল ঐ সকল সুখভোগ করিতে পারিবে? তুমি কি জান না যে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু নিকট হইতেছে? তুমি কি জান না যে, তোমার অন্তিমকালে তোমার সাংসারিক সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে এবং বৃথা জীবন ক্ষয় করিয়াছ সেজন্য তুমি দুঃসহ হৃদয়-যাতনা অনুভব করিবে? সেই অবস্থায় তোমার যদি মৃত্যু হয়, তবে তুমি সেই অপবিত্রভাবে কোন্ মুখে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবে? অসভ্য পাষণ্ড যেমন ভদ্রলোকের সমাজের যোগ্য নহে, একবার মনে করিয়া দেখ দেখি যে, তুমি অপবিত্র স্বভাব লইয়া স্বর্গীয় দেব-সভায় প্রবেশ করিবার সময় সেইরূপ অযোগ্যতা মনে করিবে কি না? তোমার পরমপিতা যদিও কৃপা করিয়া তোমাকে তথা প্রবেশ করিতে দেন,

কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ তোমার তথা যাইতে কতই লজ্জা হইবেক ?

৩। অতএব যদি শ্রেয়ঃ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে আমারদের নিজ নিজ স্বভাবকে দেব-ভাব দ্বারা পবিত্র ও সুবাসিত করিতে হইবেক। আমারদের মন স্বভাবতঃ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া আছে। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে হইবেক। সেই দমন করার ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব কেবল আত্মারই আছে। আত্মা স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারা তাহা করিয়া থাকে।

৪। কঠোপনিষদে আছে যে,—

"আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্ভোক্তেত্যাহুর্ম্মণীষিণঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণিবশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
নসতৎপদমাপ্নোতি সংসারাঞ্চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োনজায়তে ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥"

জীবাত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি আর মনকে

প্রগ্রহস্বরূপ জান। ইন্দ্রিয়সকল অশ্ব, বিষয়সকল তাহারদের চলিবার পথ, আর ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত যে আত্মা সেই ভোক্তা অর্থাৎ জীবাত্মারূপ রথীই শুভাশুভ ফলভোগ করেন। মনীষিরা এপ্রকার বলেন। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ আর সর্ব্বদা অযুক্তমনা, তাহার ইন্দ্রিয়সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্ আর সর্ব্বদা যুক্তমনা, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্, অবশচিত্ত ও সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সংসার-গতিই প্রাপ্ত হয়। যিনি বিজ্ঞানবান্, স্ববশ আর সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত তিনি সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন যাঁহা হইতে তাঁহার পতন হয় না। বিজ্ঞানই যাঁহার সারথি, মন যাঁহার প্রগ্রহ তিনি সংসার-পার সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

৫। এই বেদ-বচন হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমারদের আত্মাই রথী ও শরীর রথ। বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞান সেই রথীর আজ্ঞাধীন সারথি। ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব আর মন ঐ সারথির হস্তের প্রগ্রহ কি না রাসরজ্জু। বিষয় ইন্দ্রিয়গণের গমনের পন্থা আর গম্যস্থান ব্রহ্ম-নিকেতন। জীবাত্মা যদি বিজ্ঞানরূপ সারথির দ্বারা মনোরূপ রজ্জু দিয়া ইন্দ্রিয়স্বরূপ অশ্বগণকে আপন বশে চালাইতে না পারে, তবে সে রথ এবং জীবাত্মা স্বয়ং ও সারথি এ সমুদয় বিষয়রূপ দুর্গম পথে ভগ্ন হইয়া পড়ে আর মনোরূপ রজ্জুও ছিন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ অবিজ্ঞানবান্ জীবাত্মার নিজ দোষে; কি না, সতর্কতার অভাবে তাহার ইন্দ্রিয়গণ যদি একটু বিপথে যায় অথবা বিষয়-বর্ত্মের মধ্যে দুষ্টতা করে তবে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তা ও ভোক্তাস্বরূপ জীবাত্মার

অধোগতি হয়—তাঁহার বুদ্ধির অধোগতি হয়—তাঁহার মনের অধোগতি হয়—এবং তাঁহার শরীরেরও অধোগতি হইয়া থাকে। তিনি তদবস্থায় ব্রহ্মনিকেতনে যাইতে পারেন না। কিন্তু যিনি বিজ্ঞানবান্ যাঁহার মন বশে আছে ও ইন্দ্রিয়-দমন জন্য যিনি শুদ্ধচিত্ত তিনিই কেবল সেই বিষ্ণু-পদ লাভ করিতে পারেন।

৬। অতএব জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে দমন করাই সর্ব্বপ্রকার শুচির হেতু। ইন্দ্রিয়-দমন দ্বারা চিত্ত শুচি হইলেই আত্মা ভগবৎ-সেবার যোগ্য হয়। কিন্তু ভগবানের পদ-সেবার নিমিত্তে আত্মা ব্যাকুল হইলেই ইন্দ্রিয়দমনার্থে যত্নবান্ও হয়। নতুবা অন্যমনস্ক বিধায় প্রথমে ইন্দ্রিয়-দমনে যত্ন হয় না স্নতরাং পশ্চাৎ পাপে পতিত হইতে হয়। তথাপি ভগবানের নাম সম্বল করিয়া তাঁহারই কৃপায় মানব আপন কর্ত্তৃত্বে ও যত্নে ইন্দ্রিয়-দমন করিবেক। যাহাতে মহা অনর্থকর বিষয়-সমূহে তাহারা ভ্রাম্যমান না হয় তাহারদিগকে এমত ভাবে সর্ব্বদাই সংযমন করিবেক। মনুসংহিতাতেও ঐ বেদোক্ত বচনের পোষকতা পাওয়া যাইতেছে যথা—

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥"

যেমন সারথি রথে নিয়োজিত অশ্বসমূহের নিয়মনে যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ মনুষ্যেরা চিত্তাকর্ষণকারী বিষয়সমূহে ভ্রাম্যমান ইন্দ্রিয়গণের সংযমনের জন্য যত্নবিধান করিবেন।

"ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥"

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে আসক্তিবশতঃ মানব দোষী হন অতএব তৎসমূহকে নিয়মিত করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ হয়।

৭। ইন্দ্রিয় কাহাকে কহে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু অনেকে কেবল কাম-রিপুর সেবাকেই ইন্দ্রিয়-দোষ বলিয়া জানেন আর যাঁহার সে দোষ নাই তাঁহাকেই জিতেন্দ্রিয় কহেন। যদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে চলা যায় তবে ইন্দ্রিয়-দোষ ও ইন্দ্রিয়-দমনের বিস্তীর্ণ অর্থ হইয়া উঠে। আমারদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা কর্ণ, ত্বচ, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা। ইহারদের আসক্তির বিষয় পঞ্চপ্রকার যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ক্রমোযথা। অতঃপর কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রকার যথা বাক্, পাণি, পদ, উপস্থ ও গুহ্য। ইহারদের বিষয় পঞ্চপ্রকার ক্রমোযথা—বাক্য, গ্রহণ, গমন, জনন ইত্যাদি। সর্ব্বশুদ্ধ এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয় এবং মন তাহারদের অধিপতি। এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ও ইন্দ্রিয়গোচর লব্ধ-জ্ঞানের অবলম্বন ব্যতীত মন কোন কার্য্য করিতে পারে না। মনই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে প্রেরণ করে। মনই তাহাদের সহযোগে বিষয়ের জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক তাহা স্মরণ করিয়া রাখে এবং চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা সেই জ্ঞানকে প্রসারিত ও চিত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু সে সমুদয় জ্ঞানই বিষয় হইতে সংগ্রহ করা এজন্য তাহাকে বৈষয়িক জ্ঞান কহা যায়; আর যখন তাদৃশ কোন জ্ঞান হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া হৃদয়নাথকে নিবেদিত হয় তখনই তাহা বিষয়ের অতীত স্বর্গীয় পথে প্রসারিত হইয়া থাকে। মন যদি আত্মার বশে না থাকে, আর যে জ্ঞানলাভ করে তাহা যদি আত্মারূপ রাজার কোষাগারে প্রেরণ না করে তবেই সে মন আত্মবিরোধী ও যথেচ্ছাচারী হইল। অতএব তাহাকে আত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা ধৃতপূর্ব্বক বশে আনিতে হইবেক।

৮। মনকে বশ করিতে পারিলে তদধীন সকল ইন্দ্রিয়কেই বশ করা যায়, কেন না, এস্থলে শাস্ত্র কহেন যে, মন ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রাসস্বরূপ। আত্মারূপ রথী বা তাঁহার বিজ্ঞান সারথি যদি ভাল করিয়া তাহা ধরিতে পারেন তবে ইন্দ্রিয়গণ সৎ অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়।

৯। ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্য একেবারে করিতে না দেওয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু তাহারা কুপথে না যায় এবং সীমার বহির্ভূত না হয় অথচ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তদনুযায়ীরূপে তাহারদিগকে দমন করা, কি না, বশতাপন্ন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

"ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥"

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়। নিতান্ত ভোগ-পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না। বস্তুতঃ তাদৃশ প্রকারে কেবল একটি দুটি ইন্দ্রিয়কেই বশীভূত করিলেই যে, হইবে এমত নহে; অতএব ঐ দশটিকেই যথোপযুক্তরূপে সুশাসিত ও নিয়মিত করিতে হইবেক। তাহারদের মধ্যে উপযুক্তরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবেক।

১০। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মন ও ইন্দ্রিয়গণের বিষয় লইয়াই ব্যবহার। কিন্তু জীবাত্মা তাহারদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেই তাহারা জীবাত্মার বিষয়াতীত ভাবের অধীন হইবেক। জীবাত্মার কার্য্য ব্রহ্মারাধনা—সুতরাং তাঁহার বশীভূত মনাদি ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার ইচ্ছানুরূপ ব্রহ্ম-পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবেক এবং আপনারা বিষয়ের অপরিহার্য্য

বাধ্যতা হইতে মুক্তি লাভ করিবেক। কিন্তু জীবাত্মা যদি ব্রহ্ম-পূজায় মতি না দেয় তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক মনের সহিত ইন্দ্রিয়-দমন সম্ভবেনা।—বরং ইন্দ্রিয়গণের যে তামসী গতি তখন জীবাত্মারও সেই অধোগতি হয়।

১১। অনেকে ভদ্রতা ও সভ্যতার অনুরোধে প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় গুলিকে দমন করিতে পারেন। তাহা অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু হৃদয় ব্রহ্মপূজায় ব্রতী না হইলে, কোন না কোন ইন্দ্রিয় বিষয়ারণ্যে ভ্রাম্যমান থাকিবেই থাকিবে। ব্রহ্ম যাঁহার লক্ষ্য নহেন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই বাহ্যতঃ নিরুপদ্রব হইলেও, তাঁহার মন, ইন্দ্রিয়-লব্ধ পূর্ব্ব উপকরণ সম্বল করিয়াই মানসে কল্পিত বিষয়ের সহিত রমণ করিতে পারে। অতএব ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা কিছুতেই নিস্তার নাই।

১২। ব্রহ্মদৃষ্টি হইলেই যে একেবারে তাবত ইন্দ্রিয় দমন হইয়া থাকে এমত নহে। ফলে ইহা সত্য যে ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা কোন মতেই চূড়ান্তরূপে ইন্দ্রিয়সংযম হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মপূজায় যাঁহারদের উদ্দেশ্য আছে তাঁহারদের উচিত যত্নপূর্ব্বক সকল ইন্দ্রিয়কে যথোপযুক্ত নিয়মিত করুন।

১৩। ইত্যগ্রে বলিয়াছি যে ইন্দ্রিয়গণের আতিশয্য-দোষ নিবারণ করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণন, আস্বাদন, ও স্পর্শন এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও বাক্, পাণি, পদ প্রভৃতি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যেককে বুদ্ধিপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সীমার মধ্যে বিচরণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য—তাহা হইলেই তাহারদের দ্বারা মানব ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া লইতে পারিবে এবং তাহাতেই ভগবানের সেবকের

আত্মা সমুচিতরূপে পবিত্রতা ও শৌচ অনুভব করিবেক। সেই প্রকার শৌচ ও পবিত্রতা দ্বারাই পরমেশ্বরের সেবা হইয়া থাকে।

১৪। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়কে যথাযোগ্যরূপে সুনিয়মে সুনিয়মিত করা নিতান্তই কঠিন। মন অতি চঞ্চল, সর্ব্বদাই বিষয়ে যাইতে চাহে। ফলে সকল ইন্দ্রিয়কে উচিত মত বশে রাখিতেই হইবেক, নতুবা সেই পরম পদ লাভ হইবেক না। মনুসংহিতায় আছে যে—

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥

সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহার একটি ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়, তাহাতেই তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, যেমন চর্ম্মময়পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

১৫। অতএব জ্ঞানের আদেশে শ্রদ্ধা ও যত্নপূর্ব্বক সকল ইন্দ্রিয়েরই আতিশয্য-দোষ নিবারণ করা অতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কেবল স্বার্থ-সাধন জন্য বিষয়-সুখের দ্বার-স্বরূপ না হইয়া যাহাতে প্রত্যেকেই ধর্ম্মসাধনের উপায়স্বরূপ হয় এমতভাবে প্রত্যেককে ধর্ম্ম ও বিবেকদ্বারা সুশাসিত করিবেক। ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা কামোপভোগার্থ রিপুগণের সেবা করিবেক না।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতি প্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥ মনু ৪।১৬।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কামবশতঃ উপভোগের জন্য একান্ত আসক্ত হইবেক না; বিষয় সকল মোক্ষের বিরোধী এইরূপ মনে মনে

চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেক। নয়ন দ্বারা বিষয়-শোভা সন্দর্শন, কামজনক নৃত্য অবলোকন, কামদৃষ্টিতে নর-নারী অবলোকন, ইত্যাদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কুব্যবহার করিবেক না। কর্ণদ্বারা কামজনক সঙ্গীতবাদ্য ও পরনিন্দা প্রভৃতি শ্রবণে উৎসাহ করিবেক না। রসনা ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা অহঙ্কার প্রকাশ, কুৎসিৎ সঙ্গীত, পরনিন্দা ইত্যাদি করিবে না এবং লোভ-পরবশ হইয়া পান ভোজন করিবে না। নাসিকাদ্বারা স্বার্থ ও কামাশয়ে সুগন্ধ দ্রব্যাদির আঘ্রাণ লইবে না। কামভোগার্থ বা অহঙ্কার প্রকাশার্থ উত্তম বস্ত্র, চন্দনাদি অনুলেপন, মাল্য-ধারণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয় ও শরীরের সেবা করিবে না। এই প্রকারের বিষয়সুখ সেবা, স্বার্থসাধন ও কামোপভোগের পরিবর্ত্তে শুভাকাঙ্ক্ষীব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা ধর্ম্ম ও ভগবানের সেবা করাইয়া লইবেন। ইন্দ্রিয়দিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে জীবন সফল করিবেন। আঁখি দ্বারা ভগবানের আশ্চর্য্য রচিত জগৎ-ছবি দর্শন করিবেন। ভগবানের নাম ও ভগবানের যশোগীত ও সাধুগণের পবিত্র চরিত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিবেন। সতত হরিগুণ কীর্ত্তন, নম্রতা প্রকাশ ও ধার্ম্মিকের যশো-কীর্ত্তন করত রসনা ও বাক্যেন্দ্রিয়ের সাফল্য করিবেন। পরমেশ্বরার্থ গন্ধ পুষ্প ব্যবহার করত তৎপ্রসাদদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পুলকিত করিবেন এবং তৎসম্ভূত সুখ তাঁহারই প্রদত্ত জানিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করিবেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অখণ্ডনীয় ভৌতিক, শারীরিক ও সামাজিক নিয়ম পালন উদ্দেশে যথোপযুক্ত বস্ত্র পরিধান ও বায়ু ও উত্তাপ সেবনদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন আর কেবল তাঁহারই প্রসাদ ভাবিয়া মাল্যাদি

ধারণ করিবেন। হস্তদ্বারা তাঁহার কার্য্য করিবেন, এবং পদদ্বয়কে তাঁহারই কার্য্যার্থ গমনাগমনে নিযুক্ত রাখিবেন। যে ইন্দ্রিয়গ্রামবিশিষ্ট দেহ অদ্য বা অব্দশতান্তে অবশ্যই ত্যাগ-করিতে হইবে তাহার দ্বারা এইরূপে ভগবানের সেবা করিয়া লইবেন। তাহারই নাম ইন্দ্রিয়-দমন, তাহারই নাম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; তাহারই নাম বিষয়ত্যাগ, তাহারই নাম মায়া পরিত্যাগ। নতুবা—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
>
> মনুঃ ২। ৯৪।

বিষয়োপভোগদ্বারা কামনার কখনই শান্তি হয় না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হয়, যেমন ঘৃতদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না বরং আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

১৬। সুতরাং অভ্যাস ও সাধনাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সেবা হইতে উদ্ধার করত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবে। কিন্তু কেহ যেন এ প্রকার বিবেচনা না করেন যে অগ্রে চূড়ান্তরূপে ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়-ব্যাপার হইতে উদ্ধার করিয়া এবং ইন্দ্রিগণের কর্ত্তা মনকে একেবারে নির্ব্বিষয়ী করিয়া তবে ভগবানের সেবা করিব—কারণ তাঁহারদের শুনা আছে যে ইন্দ্রিয় দমন ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাসনায় অধিকার জন্মে না। তাঁহারদের এ প্রকার বিবেচনা ভ্রম। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা চরিত্র শোধন ও সাধুতা অভ্যাস, এবং ভগবানের উপাসনা এই দুই কার্য্য নিয়মপূর্ব্বক একই সময়ে আরম্ভ করিতে হইবেক, তাহাতেই বরং পরমেশ্বরের নামের গুণে ইন্দ্রিয় সকল সুচারু-রূপে বশীভূত হইতে থাকিবেক এবং যৎপরিমাণে তাহারা

বশীভূত হইবে তৎপরিমাণে হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের দর্শন পাওয়া যাইবেক। নচেৎ সমুদয় বিষয়ব্যাপারের অন্ত হউক—সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরস্ত হউক, মানসিক তর্ক-তরঙ্গ স্থির হউক, তখন আমি হরি স্মরণ করিব এ প্রকার আশা দুরাশামাত্র কেন না শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

যইচ্ছতি হরিং স্মর্ত্তুং ব্যাপারাস্তগতৈরপিঃ।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নানমিচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমত ইচ্ছা করে যে ঐ সকল ব্যাপার অস্তগত হইলে আমি শ্রীহরি স্মরণ করিব তাহার সে ইচ্ছা তদ্রূপ, যেমন কোন ব্যক্তি দুর্ম্মতিবশতঃ মনে করে যে সমুদ্রের তরঙ্গ শান্ত হইলে আমি তখন তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিব।

১৭। কিন্তু ইন্দ্রিয়-দমন দ্বারা চরিত্রকে পবিত্র করিতেই হইবেক। যদিও সে সাধন সম্পূর্ণ না হউক কিন্তু তাহাকে ভগবদুপাসনার আনুষঙ্গিক করিয়া রাখিতেই হইবেক। কারণ ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত নর-হৃদয় পবিত্র হয় না। বিনা পবিত্রতা পরমেশ্বরের সেবায় বিশেষ অধিকার হয় না। আবার ইন্দ্রিয়-সংযমের সঙ্গে সঙ্গে ব্যতীত যেমন ব্রহ্মসেবা সম্ভবেনা সেইরূপ হরিনাম সহায় না করিলে প্রকৃত ইন্দ্রিয়-সংযমও হয় না। উপাসকের পবিত্রতা ও উপাস্য দেবতার নিত্যসেবা এই দুইটি কার্য্যই একত্রে থাকা প্রয়োজন। নতুবা তুমি সর্ব্বদা হরিনামও কর আবার বিষয়েও উন্মত্ত, কিম্বা বিষয় ত্যাগ করিয়াছ—ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছ, কিন্তু হরিনাম কর না, তোমার জীবনে এই প্রকার দ্বন্দ্বভাব নিতান্তই শোচনীয়।

১৮। চরিত্রের পবিত্রতা যেমন পরমেশ্বরের সেবার্থ নিতান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ জীবনে বিশুদ্ধ পবিত্রতা সম্পাদনার্থে

পরমেশ্বরের সেবা একান্ত আবশ্যক। সেবকের হৃদয়কে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-বিহীন পবিত্র-ভাবাপন্ন দেখিলেই পরমেশ্বর তাঁহাকে সাত্ত্বিকী ভক্তি প্রদান করেন।

ভক্তেঃ ফলং পরং প্রেম তৃপ্ত্যভাবস্বভাবকং।
অবান্তরফলেষ্বেতৎ অতিহেয়ং সতাং মতং॥

ভাগবতামৃত ২খ, ২অঃ ১৯৫ শ্লোক।

সেই সাত্ত্বিকী ভক্তির ফল পরম প্রেম। সেই প্রেমের স্বভাব এই যে, তাহাতে কখন তৃপ্তির শেষ হয় না। তদ্ভিন্ন অন্য ফল তাহার নিকট অতি হেয়। ইহা সাধুদিগের মত।

তদ্ধি ভক্তেঃ ফলং মূলং ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
সদাসন্দর্শনক্রীড়ানন্দলাভাদি মন্যতে॥

ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দর্শন করা, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করা, তাঁহার সেবায় আনন্দ লাভ করা এই সকল সেই ভক্তির মূল ফল।

১৯। কিন্তু ভগবানের পূজা উদ্দেশ না করিয়া চরিত্র-শোধন করিতে চেষ্টা করা আর চূড়ান্তরূপে বিষয়ী হওয়া একই কথা। যেখানে ভগবানের পূজা লক্ষ্য না থাকিয়া স্বভাবকে সুন্দর করিতে চেষ্টা হয় সেখানকার লক্ষ্য সম্মান ও যশঃ। সম্মান ও যশঃ বিষয়রূপ বিষবৃক্ষের সুচারু পুষ্পস্বরূপ। আপাততঃ তাহার গন্ধ তোমার মনোহরণ করিতে পারে কিন্তু নিশ্চিত জানিও অন্তে তাহা বিষফলই প্রসব করিবেক।

২০। ফলে ভগবানের পূজার নিমিত্তে—তাঁহার চরণ-সেবার যোগ্য হইবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় ও রিপু সমূহকে দমন পূর্ব্বক, যে সাধু চরিত্র প্রস্তুত হয় তাহাতে হয়তো এ সংসারে দরিদ্রতা উৎপন্ন করে—ভগবানের সেবকের উদরে হয়তো

অন্ন থাকে না, পরিধানে হয়তো বসন থাকে না—অন্তকরণেও তাঁহার দীনহীনতা বিরাজ করে। কিন্তু তিনি স্বয়ং সংসারের কষ্ট মনে করিতে পারেন না—সে সম্বন্ধে লোকেই তাঁহাকে দরিদ্র বলে এইমাত্র, তিনি সেই ভক্তবৎসলের দ্বারে প্রেমের ভিখারীরূপে দণ্ডায়মান থাকেন—প্রেম যতই পান তাঁহার দরিদ্র-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার আর পরিসমাপ্তি হয় না। সুতরাং তিনি স্বয়ং আপনাকে অতি দীন বলিয়াই জানেন। ঈশ্বরার্থে যে পবিত্রতা তাহার পুষ্পের এই ভাব, কিন্তু নিশ্চিত জানিও যে তাহা হইতেই অন্তে অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভগবান কহেন, আমার যে করে আশ, আমি করি
তার সর্ব্বনাশ, তবু যদি আমার না ছাড়ে আশ, আমি
হই তার দাসের দাস।

এক দিকে পরমেশ্বরের দাস্য-কর্ম্ম আর এক দিকে যশঃ ও ধন-সম্পত্তির দাস্য-কর্ম্ম—একটি শ্রেয়ঃ, আর একটি প্রেয়ঃ এই দুইটি পথ মানবের সম্মুখে আছে। আমারদের স্বাধীনতাও আছে, যে পথে ইচ্ছা সেই পথে যাইতে পারি। ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ মত্ত বারণ তুল্য কেবল বিষয়ারণ্যের পথেই বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু বিবেক দ্বারা তাহাকে দমন করিতে হইবেক এবং সেইরূপ দমন করিবার নিমিত্তেও আমারদের ভগবদ্দত্ত স্বাধীনতা আছে। অতএব আমরা যদি শ্রেয়োভিলাষী হই, আর যত্ন করি তবে অবশ্যই ইন্দ্রিয়-দমন ও মন-সংযমন করত এবং ক্রমে বিবেক ও বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক পরম পিতার সেবায় পূর্ণ অধিকার পাইতে পারি। এমন মহদধিকার—এমন অমৃত ফল হইতে বঞ্চিত হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। এ নিমিত্তে সতর্ক হওয়া উচিত যেন আমরা বিষয়ের

স্রোতে পড়িয়া ক্রমে গিয়া নৈরাশ-সাগরে উপস্থিত না হই। যাঁহারা আপনারদের দোষে ঐরূপ মহাকালস্বরূপ সংসার পারাবারে পতিত হইয়াছেন তাঁহারদের অবস্থা কি ভয়ানক। তথা নানাপ্রকার অভিমান ও প্রবৃত্তিগণের ভয়ানক তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে; শোক, দুঃখ, জ্বালা ও যন্ত্রণার হাহাকার উঠিতেছে। তাদৃশ বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের স্বীয় স্বীয় শুভ বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা তখন স্ফূর্ত্তি পায় না, তবে উহারই মধ্যে যদি কাহারো জন্মের মধ্যে এক মুহূর্ত্তকালও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিনাম শুনা হইয়া থাকে, অথবা এক দিনের নিমিত্তেও যদি কখন সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই ঘোরতর নৈরাশ-সাগরের মধ্যে, সেই ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তের শ্রবণকরা হরিনাম ও সেই শুভ দিনের লব্ধ সাধুসঙ্গের কথা যদি একবার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় তবে ঐ হতভাগার পক্ষে তাহাই ইন্দ্রিয়চাপল্য হইতে তরিবার উপায় হইয়া উঠে ইতি।

সংখ্যা ৯

ষষ্ঠী

প্রাতঃকালের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

ধর্ম্ম।

১। সমুদ্রোত্থিত জলদজাল পর্ব্বত শেখরে বর্ষিত হইয়া নদীরূপে পুনর্ব্বার যেমন সাগরে প্রবাহিত হয় এবং সেই সকল নদীস্রোত পার্ব্বতীয় রাজ্য হইতে উৎপাদ্য-মৃত্তিকা আনিয়া পথিমধ্যে যেমন নানা দেশকে উর্ব্বরা করিয়া যায়, সেইরূপ মানবের আশা-অশ্রু-ঘন ও প্রীতির বাষ্পরাশি এই ভবসমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আনন্দ-জলধারাতে স্বর্গ-শেখর-স্থিত প্রাণ-সখার চরণ-কমলকে ধৌত করে এবং সেই শ্রীচরণ-ধৌত প্রেম-বারি-ধারা মন্দাকিনী স্বরূপে নরলোকে প্রবাহিত হইয়া তাহার প্রত্যেক বিভাগকে উর্ব্বরা করত পুনরায় ভবসাগর-সমাগম লাভ করে। যখন মানবের তত্ত্বজ্ঞান ও সাত্ত্বিকী প্রীতি এই প্রকারে ভগবানের পূজা করিয়া ভগবৎপ্রিয়কার্য্য সাধনার্থে পুনরায় সংসারে প্রবাহিত হয়, তখনই অধঃস্থায়ী এই ধরাধামে প্রকৃত ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হইয়া ধরণীকে স্বর্গ-তুল্য করে। যখন নরের বিষয়োন্মুক্তা একনিষ্ঠা প্রীতি পরা বিদ্যার যোগে ঈশ্বরের প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া এইরূপে ধরারাজ্যকে উর্ব্বরা

করিতে যায়, তখনি এই মর্ত্ত্যলোকে প্রকৃত ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়। যখন ভগবানের প্রতি দৃঢ় প্রেম এবং তাঁহার দাস্য-কর্ম্ম সামঞ্জস্য লাভ করে অর্থাৎ যখন তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান মিলিত হয়, তখনি এই ভূলোকে স্বর্গীয় ধর্ম্ম অবতরণ করে। যখন বিষ্ণুপ্রীতি সংসারধর্ম্মে প্রীতি দান করে, যখন ভগবৎ-প্রেমানন্দ পরিবার মধ্যে ও জন সমাজে আনন্দোৎসব সম্পন্ন করে, যখন গৃহস্থের ভগবানে নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণতা মিলিত হইয়া সমগ্র সংসারব্রত শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পিত করে এবং যখন সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জীবন্ত স্রোতে তত্ত্বজ্ঞানী ভাসমান হইয়া তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে আপনার অনুষ্ঠান এবং আপনার অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা দর্শন করেন, তখনি এই নরলোকে সেই কৃপাময়ের মহাপূজা ষোড়শোপচারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন ভগবানের অস্তিত্বজ্ঞান সম্যক্ ভাবে নর-হৃদয়কে অধিকার করে; যখন ভগবৎস্বরূপের যথা-সম্ভব জ্ঞান জ্বলন্ত প্রদীপবৎ জীবাত্মার অজ্ঞানান্ধকার দূর করে; যখন নারায়ণের পূজার আনন্দাশ্রু পাপীর যন্ত্রণা-প্রপীড়িত হৃদয়কে ধৌত করে; যখন ভগবানের পূজোপলক্ষে শরীর, মন ও আত্মা নিযুক্ত হয়; যখন তাঁহার পূজা লক্ষ্য করিয়া দরিদ্র-মণ্ডলে অন্ন, জল, আচ্ছাদন, তৈল, মিষ্টান্ন, গাভী, যথা-সম্ভব রজত, কাঞ্চন, ভূমি প্রভৃতি বিতরিত হয়; যখন বিদ্যার্থী, জ্ঞানার্থী, ধর্ম্মার্থী ও প্রেমার্থী জন-নিকরে বা পরিবার মধ্যে উপদেশ, সদ্‌গ্রন্থ এবং ঈশ্বর-প্রসঙ্গ প্রচারিত হয় তখনই সেই পরাৎপরের মহাপূজা মর্ত্ত্যপুরে প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ইহকাল পরকালের জন্য মানব ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করত সামীপ্য মুক্তির প্রার্থনা করেন এবং ইহকালে যথাসাধ্য

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও জীবনব্রত উজ্জাপনানন্তর সেই পিতৃ-নিকেতনে যাইবার অভিলাষী হন তখনই প্রকৃত পূজা ও প্রকৃত ধর্ম্মের আচরণ হয়। ধর্ম্ম অতি উদার আনন্দকর ও অচিন্তনীয় পদার্থ। জ্ঞান প্রীতি ও সদনুষ্ঠান তিনই ধর্ম্মের অঙ্গ। জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী সকলের পক্ষে ধর্ম্ম মধুস্বরূপ। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" সকল জ্ঞান, সকল আচরণ ও সকল ভূতের মধ্যে ধর্ম্ম প্রাণস্বরূপ। জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সার জ্ঞান, মূল জ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞান কেবল ধর্ম্মজ্ঞান। অপত্যস্নেহ, পিতৃ-মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বনিতানুরাগ, মিত্রতা, আদর, সম্ভাষণ, সম্মান, বিনয়, শিষ্টতা, প্রণাম, নমস্কার এই যত প্রকার সুরভি কুসুম নরের গার্হস্থ্য ও সামাজিক উদ্যানে বিকশিত হয়, ধর্ম্মই তাহার মকরন্দ স্বরূপ। মেঘের সুরাগ-রঞ্জিত কান্তি-চ্ছটা, চন্দ্র-সূর্য্য-তারকামণ্ডলীর জ্যোতির ঘটা, বন উপবন গিরি নদীর মনোহর দৃশ্য এ সকল দর্শনে হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয় ধর্ম্মই তাহার সার ভাগ। সুগাথক বিহঙ্গদলের সুমধুর সঙ্গীত-রস যে কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে তাহার সার অংশই ধর্ম্ম। সুরভি কুসুমের গন্ধে, সুমিষ্ট ফলের আস্বাদনে, শীতল বায়ুর স্পর্শনে যে আনন্দানুভূত হয় তাহার সারগ্রহণ ধর্ম্মানন্দ। পূর্ব্বকাল হইতে সংসার-ধর্ম্মে যত সদনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার সার ভাগই ধর্ম্ম। অতি পূর্ব্বকালের যাগ যজ্ঞে, মধ্যকালের ব্রহ্মোপাসনায়, ইদানীর উপাসনা-প্রণালীতে, শ্রাদ্ধে, তীর্থ-যাত্রায়, ব্রত-অনশনে ও দেবালয়ে সর্ব্বত্রেই ধর্ম্ম প্রাণ-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আসিয়াছেন।

২। ধর্ম্মরূপ কল্প-মহীরুহ-তলে আমারদের নিবাস—

সে তরু আমারদিগকে সুরভি ফুল ও সুমিষ্ট ফল দান করে। ধর্ম্মরূপ পবিত্র সরোবর আমারদের হৃদয়ে—সে সরোবরে অবগাহন করিয়া আমরা তাপিত প্রাণ শীতল করি। ধর্ম্মরূপ পরিষ্কার মহাদর্পণ আমারদের পূর্ণ আদর্শ, তাহাতে আমরা অধ্যাত্মতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, কর্ত্তব্যতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব দর্শন করি। ধর্ম্মের সহিত আমারদের চিরন্তন সম্বন্ধ। জগতে চতুর্দ্দিকে যত মঙ্গলনিয়ম, মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলধ্বনি, মঙ্গলবাদ্য দৃষ্ট ও শ্রুত হয় সে সমুদয়ই জীবন-স্বরূপ ধর্ম্মের মধ্যগত। আমরা ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম আমারদের মধ্যে বিরাজিত। ধর্ম্মরূপ মহা-কাশের মধ্যবিন্দুতে আমারদের নিবাস, তাহার চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের অপার বিস্তৃতি এবং সেই সমগ্র বিস্তৃত ক্ষেত্র আমারদের রঙ্গ-ভূমি। সেইরূপ ধর্ম্ম সৌরজগতের মধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রাণরূপে আমারদের অন্তরাকাশের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত আছেন এবং আমারদের হৃদয়াকাশের সর্ব্বদিকে সেই ধর্ম্মের অধিকার। ভূভার বিনাশ নিমিত্তে, সত্যের জয় বিধান জন্য, ধর্ম্মরূপ ঈশ্বরের করুণা-ভাণ্ডার পুণ্য-মুক্তামণি ও সত্য-কাঞ্চনরজতে, জ্ঞানাস্ত্রশস্ত্রে ও প্রেম-স্নেহপদার্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রোগীর শয্যা; শ্রান্তের আসন; তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়; ক্ষুধিতের ভোজ্য; দীন অন্ধ কৃপাপাত্রদিগের ঔষধ, পথ্য, আহার, রক্ষণীয়, স্নেহ-দ্রব্য প্রভৃতি ধর্ম্মের উদার সদাব্রতে দান হয়। যেখানে, যে সৌভাগ্যবানের নিকেতনে, যে মহাত্মার হৃদয়গত যত্নে যৎ-পরিমাণে এই সকল দান আচরিত হয় সেখানে তৎপরিমাণে ধর্ম্ম। সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ, সাহসের পর্ব্বতস্বরূপ, অকূল ভয়-পারাবারের কূলস্বরূপ, স্নেহ ও যত্নের সাগরস্বরূপ, প্রতিপালনার্থ গিরিতুল্য ভারবাহী পরম পূজনীয়

পিতার লোকান্তর হইলে, চতুর্দ্দিকব্যাপী ঘন বিষাদের ও হাহাকার ধ্বনির মধ্য হইতে ক্রমে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায় তাহা ধর্ম্ম হইতেই। স্নেহময়ীমাতৃক্রোড়হারা হইলে দুর্ভাগা সন্তান একাএক ধর্ম্মের সদাব্রতে প্রতিপালিত হয়। গৃহের প্রেম-কুসুম-স্বরূপ—পার্থিব সর্ব্ব ধনের সার রত্নস্বরূপ—বিকশিত-মুখারবিন্দ শিশুর মৃত্যুজন্য পিতা মাতা হৃদয়বিদারক শোকাগ্নির মধ্যেও যে ক্রমে ক্রমে সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন সেও ধর্ম্মের অমূল্য দান। যে স্থানে, যে পরিমাণে, যে কোন প্রকারে মঙ্গল লাভ, মঙ্গলানুষ্ঠান হয় তাহাই ধর্ম্ম। যাহা কিছু হৃদয়ের গ্রাহ্য, সত্য, জীবন্ত, মহৎ, পবিত্র, প্রেম-যুক্ত, জ্ঞানযুক্ত ও ভক্তিযুক্ত, তাহাই ধর্ম্মের মধ্যগত। কিন্তু যাহা কিছু অনাত্মীয়, অপবিত্র, নির্জ্জীব, মূঢ়তা ও অল্পতা তাহা কখন ধর্ম্ম নহে।

৩। ধর্ম্ম কোন এক ব্যক্তির, দেশের, কালের বা শাস্ত্রের সৃষ্ট নহে। মানব-প্রকৃতিতে ধর্ম্মই ঈশ্বরের বিশেষ দান। ধর্ম্ম সৃষ্টি কাল হইতেই মানবের প্রাণ, জীবন ও একমাত্র সনাতন সম্পত্তি।

একএব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধিগচ্ছতি॥

ধর্ম্মই কেবল একমাত্র মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন। আর সমুদয়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। সকল সম্প্রদায়ের মতের মধ্যেই প্রাণস্বরূপে ধর্ম্ম অবস্থিতি করেন। ধর্ম্ম অনপেক্ষিক—কাহারও অপেক্ষা করেন না; একাএক—কোন মধ্যবিতের আবশ্যক করেন না; আবদ্ধতাশূন্য—তাঁহার পথে কোন বাধা বিঘ্ন তিষ্ঠিতে পারে না; ধ্রুব—কোন সংশয়

তাঁহাতে স্থান পায় না; সহজ—তিনি আমারদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াছেন; সাধারণ—সকলের অন্তরে—সকল শাস্ত্রের মধ্যে—সকল জগতের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি স্বাধীন ও উপরোধ অনুরোধ বিহীন; প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহাতে সরল ও স্ব স্ব অধিকার। ধর্ম্ম আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ—সকলের আত্মাই তাঁহার উত্তাপ অনুভব করে; ধর্ম্ম যুক্তিসিদ্ধ, যত তর্কবিতর্ক কর, যত বাগাড়ম্বর কর, অবশেষে তাঁহারই জয় হইবেক; ধর্ম্ম কখনও সম্প্রদায়-গত লক্ষণাক্রান্ত নহেন। ধর্ম্মকে লইয়া কাহারও বিবাদ নাই। যে অধার্ম্মিক সেও ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করে এবং ধর্ম্মের বেশ পরিধান করিয়া আপনার অধার্ম্মিকতা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। অতএব ধর্ম্ম কি আশ্চর্য্য পদার্থ! ধর্ম্ম অসভ্য বর্ব্বরের হৃদয়ে বাস করত তাহাকে উন্মত্ত করেন এবং সুসভ্য গৃহস্থের আলয়ে কুল-লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন। গৃহধর্ম্মত্যাগী উদাসীনগণও মধুময় ধর্ম্মের শাসন লঙ্ঘন করিতে পারেন না। ধনের আড়ম্বর, স্বার্থ-পরতার আকর্ষণ, প্রজ্বলিত সমরানল কিছুতেই ধর্ম্ম পরা-জিত হয় নাই। বরং বিপদ ও শোকের রোল, ধনসম্পত্তির উন্মত্ততা ভেদ করিয়া এক এক বার রাশি রাশি ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রকাশ পাইয়াছে। মহা মহা শোকপূর্ণ বিপদ-জলদের মধ্য হইতে ধর্ম্মরূপ উদ্যত বজ্র নির্ঘোষিত হইয়া একেবারে শত শত আত্মাকে চেতন করিয়া দিয়াছে। মোহ ও অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে মানবের হৃদয় ভেদ করত অকস্মাৎ ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পাপরাশিকে তূলা-রাশির ন্যায় ভস্মীভূত করিয়াছে—অন্ধকারময় ধরারাজ্যের

ও মনোরাজ্যের প্রত্যেক বিভাগকে মহাতেজে জীবন্ত ও আলোকাকীর্ণ করিয়াছে।

৪। ভক্তিই মূল, জ্ঞানই মূল, সদনুষ্ঠানই মূল। যদিও ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিশুদ্ধরূপে সর্ব্বত্রে বিরাজ না করুক, কিন্তু ভক্তি, প্রেম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস চতুর্দ্দিকেই দেখা যাইতেছে। দুর্গোৎসব, ও বিগ্রহসেবা প্রভৃতি ভারতীয় উৎসবে ও পূজা-অর্চ্চনায় কত উৎসাহ ও হৃদয়ব্যাকুলতা দৃষ্ট হইতেছে। গন্ধ, চন্দন, ধূপ, ধুনা, দান, হোম, মন্ত্রপাঠ ভক্তিভাবে মাখা। গঙ্গাতীরে যোগ-সময়ে সহস্র সহস্র লোকের অবগাহন ও স্তোত্র-পাঠে আশ্চর্য্য ভক্তির চিহ্ন দেখা যায়। মুসলমানদিগের বক্ষে করাঘাত ও উচ্চৈঃস্বরবিশিষ্ট ঈশ্বরারাধনার মধ্যে ভক্তিরই ভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্টিয়ান-গণের প্রার্থনা, বন্দনা ও কঠোর প্রচারব্রতের মধ্যে ভক্তিরই ভাব দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। জ্ঞান হয় জগতের লোকেরা যেন পিতৃহারা মাতৃহারা হইয়া চতুর্দ্দিকে কান্দিতেছে। পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং ধর্ম্মের ভাবদ্বারা হৃদয়কে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্তে চারিদিকে প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইতেছে। খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় ঈশা পয়গম্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। মুসলমানেরা কোরাণ ও কলমা পাঠ এবং “তৌবা” উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তের যাচক হইতেছেন। হিন্দুগণ কড়ি, বস্ত্র, ভোজনপাত্র, জলপাত্র, তণ্ডুলাদি সম্বলিত ভোজ্যদ্রব্য, ফল, মিষ্টান্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, গাভী প্রভৃতি উৎসর্গ করিতেছেন। অনেক নরাধম পাপা তাহা না করিতে পারিয়া নেত্র-সলিল-দ্বারা আপন আপন পাপ প্রক্ষালনের যত্ন করিতেছে।

চতুর্দ্দিকেই পরমেশ্বরের নামধ্বনি শুনা যাইতেছে। কোন স্থানে "মা মা" শব্দ আকাশ পূর্ণ ও কর্ণ বধির করিতেছে—কোন স্থানে "শিব শিব হর হর" শব্দ চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মরাগ বিস্তার করিতেছে। অতএব ভক্তিই মূল।

৫। ভক্তিরূপ স্বর্গীয় লতা যখন জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে তখনই ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়বে পূর্ণ হয়। ভক্তি প্রকৃতি-স্বরূপিণী, জ্ঞান পুরুষস্বরূপ। আরণ্যকের ঋষিগণের উপনিষৎ ও ব্যাস-বিরচিত মীমাংসাকাণ্ড পাঠ কর—সেখানে জ্ঞান ও ভক্তি যেন এক। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঐ দুইয়ের যোগকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন। বৈষ্ণবেরা ঐ দুইয়ের যোগকে প্রেম বলেন। যোগীরা ঐ দুইয়ের যোগকে যোগানন্দ বলেন। কর্ম্মীরা উহাকে ধর্ম্ম বলেন। ভাগ্যবানেরা উহাকে লক্ষ্মী বলেন এবং হতভাগ্য ব্যক্তিরা উহারই গন্ধে উন্মত্ত হইয়া কস্তুরিকানাভ হরিণীর ন্যায় স্বীয় নাভিকুণ্ডস্থিত মৃগমদ ত্যজিয়া বিষয়ারণ্যে উহার অন্বেষণ করিয়া থাকে। উহাকে ভক্তিই বল, প্রেমই বল, জ্ঞানই বল, আর ধর্ম্মই বল, আর যাহাই বল উহা আদিকাল হইতে মানব-বংশকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন মানব ঈশ্বরকর্ত্তৃক এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছেন সেই দিনই ঈশ্বর ঐ পরম-ধর্ম্মের বীজ মানবের হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই অক্ষয় শস্যের বীজ এই পৃথিবীতে বপিত হইলে কেবল যে, এখানকার নিমিত্তেই জীবিকা লাভ হয় এমত নহে, কিন্তু তাহার শস্যসকল দেহান্তে মানবের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া পর-লোকের নিমিত্তে অক্ষয় সম্বল হইয়া থাকে।

৫। ধন্য পরমেশ্বরের দান যাহা স্বর্গ মর্ত্ত এক করিয়াছে। যাহা অসভ্য বর্ব্বর হইতে সুসভ্য পণ্ডিত পর্য্যন্ত—দীন হীন

নিরন্ন দরিদ্র অবধি কোটীশ্বর নরপতি পর্য্যন্ত সকলকে ভয় ও মিত্রতা দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি তরুতলে বাস করিয়াও—শাকান্ন দ্বারা উদরপূর্ত্তি করত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। হা ধর্ম্ম! তোমাকে লইয়া বনবাসী হওয়াও ভাল, কেন না, তুমিই আমারদের মরণ-কালের সুহৃদ। যখন বন্ধুবান্ধব সকলে ত্যাগ করিবে তখন তুমি রক্ষা করিবে। যখন সংসার অদর্শন হইবে তখন তুমিই হস্ত ধরিয়া আমারদিগকে পিতার পদতলে উপস্থিত করিবে। যখন এই জীবনের বসন্তশোভা তিরোহিত হইবেক তখন তুমিই একাকী আমারদের আত্মাতে স্বর্গীয় বসন্তশোভা-বিশিষ্ট সুমধুর নব জীবন সঞ্চার করিবে। ধিক্ তাহার ধনে যে তোমাকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিল না, ধিক্ তাহার জ্ঞানে যে তোমাকে চক্ষু দিয়া দেখিল না,ধিক্ তাহার মানে যে তোমাকে সম্মান দিল না, ধিক্ তাহার জীবনে যে তোমাকে প্রাণ বলিয়া জানিল না ইতি।

সাম্বৎসরিক উৎসব।

দ্বারভাঙ্গা,

২৯ মাঘ ১৭৯৬ শক।

বসন্তপঞ্চমী।

ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব।

সংখ্যা ১০

ঊষাকাল।

ব্রহ্মপূজা-সূচক বোধন।

যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভুবনের একমাত্র অধীশ্বর, যিনি সমস্ত জগতের জীবনস্বরূপ এবং আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা, যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে সমস্ত জগতের সাধু, সজ্জন ও মুনিগণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, অদ্য আমরা এই মাঘের ঊনবিংশ দিবসে শুক্লপক্ষে বসন্ত-পঞ্চমী তিথিতে ঊষাকালে সেই পরম পুরুষের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য এক বৎসর পরে আবার সম্মিলিত হইয়াছি। অতিপূর্ব্বকালে ভারতীয়-ব্রহ্মর্ষিগণের হৃদয়ক্ষেত্রে যত সুদৃশ্য ও সুগন্ধ প্রীতিকুসুম বিকশিত হইয়াছিল; পরমকারুণিক পরমেশ্বরের নাম মাত্রে আমারদের হৃদয়ে যত প্রেমপুষ্প অদ্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে সে সমুদয়ই তাঁহার মহাপূজার নিমিত্তে প্রস্তুত আছে। জগৎকর্ত্তার অধিষ্ঠানবশতঃ আকাশমণ্ডলে সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র সকল তাঁহার পূজার ধূপ দীপ হইয়াছে, এই প্রত্যুষের বসন্ত-মারুত তাঁহাকে চামর বীজন করণার্থে উপস্থিত আছে, বসন্তের নানাবিধ ফুল এইমাত্র প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইবার নিমিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছে—কেন না, তাঁহার চরণস্পর্শেই তাহারদের ক্ষণস্থায়ী মনোহর জীবন সার্থক হইবেক, আমারদের রিপুগণ

আজ প্রভুর পূজার বলিস্বরূপে বিজ্ঞান-যূপে বদ্ধ হইয়া আছে, অতঃপর আত্মার পবিত্র হোমকুণ্ডে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইল; এই সকল অনুকূল ব্যাপারের মধ্যে এই শুভক্ষণে তাঁহার পূজা আরম্ভ কর। হৃদয়-থাল ভরিয়া নিজ নিজ উদ্যানের প্রেমপুষ্প সকল প্রভুর শ্রীচরণে উপহার দেও, ঋষিদিগের আত্মাক্ষেত্রজ কুসুম সকল অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া তাঁহার পদে অর্পণ কর, সুরভি বসন্ত-কুসুমরাশি ভারে ভারে তাঁহার চরণে বিকীর্ণ কর এবং আপনারদের আর যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দেও। এইরূপে তাঁহার পূজা করত আত্মা, মন, প্রাণ, শীতল কর; আপন আপন দেহ, জীবন ও সংসারধর্ম্ম পবিত্র কর।

সংখ্যা ১১

প্রাতঃকালের বক্তৃতা।

উপনিষৎ ও উত্তরমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মতের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ঐক্যানৈক্যসম্বন্ধ।

১। পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ হইল মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতভূমির অক্ষয় মঙ্গল কামনায় বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বঙ্গের যে অশেষ কল্যাণ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্রের আলোচনা বঙ্গভূমিতে ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজকে উপলক্ষ করিয়া রামমোহন রায়ের সময় হইতে চারিদিকে ঐ সকল শাস্ত্রের জ্ঞান প্রচার হইয়া আসিতেছে। বৈদান্তিক গ্রন্থসকল মুদ্রিত হইয়া জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হিন্দুগণের ভবন পূর্ণ হইয়াছে। বৈদান্তিক জ্ঞান চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে প্রচার হইয়া অনেক সাধুপুরুষ বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াই বিষয়াতীত অতীন্দ্রিয় পুরুষের জ্ঞানানুভবে সক্ষম হইয়াছেন। যে ব্রহ্মবিদ্যারূপ কল্পলতিকা সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রমোপবনে প্রস্ফুটিত হইয়া ঋষি, ঋষিকুমার, ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যাগণের মনোমোহন করিত; ঋষিকুলের লোপ হইলে পর শঙ্করাচার্য্য যাহাকে বক্ষে করিয়া সংসারত্যাগী হন এবং অরণ্যের মধ্যে যাহার অশেষ উন্নতি সাধন

করেন ; রামমোহন রায়ের প্রসাদে, সেই মহাবিদ্যা আমাদের গৃহমালঞ্চকে আলো করিয়াছে।

২। মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতীয় শাস্ত্র হইতেই উপকরণ লইয়া ব্রাহ্মসমাজকে গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বাহ্য অবয়ব যতই পরিবর্ত্তিত হউক, কিন্তু শাস্ত্রীয় উপকরণ সকল তাহার অন্তঃসার হইয়া আছে।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উদার ধর্ম্ম। কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা, বাধা, বিঘ্ন, অনুরোধ, উপরোধ তাহাতে স্থান পায় না। ইহার সম্মুখে শাস্ত্রের আধিপত্য নাই, তর্কের আধিপত্য নাই, অলৌকিক বিশ্বাসের আধিপত্য নাই, দেবগণের আধিপত্য নাই এবং জাতির আধিপত্য নাই। ইহার মতে আত্মপ্রত্যয়ই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল ভূমি, ব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা, এবং তিনি স্বয়ং মুক্তি ও গতিস্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে মৃত্যুর পর পরলোক আছে এবং সত্য, দয়া, ন্যায়পরতা, প্রেম, সৌহার্দ্দ্য, সরলতা প্রভৃতি অনেক প্রকার মণিরত্ন উহার নীতির ভাণ্ডারে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪। কিন্তু কেহ যেন এমত মনে না করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ সকল মত শাস্ত্র ছাড়া অথবা বিজাতীয়-ভাবাক্রান্ত কতিপয় ব্রাহ্মের স্বকপোলকল্পিত।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে যেমন শাস্ত্রের আধিপত্য নাই, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদেতেও সেইরূপ শাস্ত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে।

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে।"

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় শ্রুতিমাত্র অপেক্ষিত নহে" অনুভবের প্রয়োজন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় শাস্ত্রের দাস হইতে হয় না।

৬। অতএব ব্রাহ্মসমাজে যে শাস্ত্রের আধিপত্য নাই তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। পূর্ব্বকালের ব্রহ্মবাদীরা যেমন জ্ঞানকে আদর করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অনাদর করিতেন, এখন ব্রাহ্ম-সমাজে সেই ভাবেরই প্রবলতা দেখা যাইতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মেরও আধিপত্য নাই।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একদিকে যেমন তর্কের আধিপত্য নাই, অন্যদিকে সেইরূপ অলৌকিক অন্ধ বিশ্বাসেরও প্রাদুর্ভাব নাই। কঠ-শ্রুতিতে আছে "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া" পরমেশ্বরেতে যে মতি তাহা তর্কেতে প্রাপণীয় নহে। এবং শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন যে, অলৌকিক ফলশ্রুতিতে লোকে যেমন অন্ধবিশ্বাস করে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সেরূপ অন্ধবিশ্বাস প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়মূলক অনুভব, যুক্তি ও বিচারের প্রয়োজন।

৮। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে দেবগণের আধিপত্য নাই। শাস্ত্রেই আছে যে,ব্রহ্মের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত দেবতা কল্পিত হইয়াছে।

"এবংগুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥"

অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় কেবল ব্রহ্মই পূজনীয়। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে দেবতাদের স্বতন্ত্র দেবত্ব থাকে না।

৯। ব্রাহ্মধর্ম্মে জাতির আধিপত্য নাই। সকলেই ভগবানের সন্তান, সকলেই তাঁহাকে আরাধনা ও তাঁহার জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের অধিকার যে জাতীয় লোকের জন্মিবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহারই অধিকার। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আবীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যেচ পাপাযদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈপ্রভবিষ্ণবেনমঃ॥"

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আবীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি লোক ও অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিরা যাঁহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয় সেই বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।

গীতাতে আছে—

"মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃপাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাংগতিং॥"

কি চণ্ডালাদি, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই পরমেশ্বরের সেবা দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রুতিতে আছে—

"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাৎলোকাৎ প্রৈতি সব্রাহ্মণঃ।"

যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া এই লোক হইতে অবসৃত হয়েন তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে জানিলে লোকে ব্রাহ্মণ হয়। সেই ব্রাহ্মণত্ব-লাভে সকলেরই অধিকার আছে।*

১০। অতএব ব্রাহ্মসমাজ যে বলেন "ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই" তাহা শাস্ত্র-

* ব্রাহ্মণ শব্দের প্রকৃত অর্থ বজ্রসূচী-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সম্মত। ফলে অনেক অদূরদর্শী ব্রাহ্ম মনে করেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজ বুঝি ঐ ভাবটি খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন। তাহাই মনে করিয়া তাঁহারা যৌবন-স্থলভ-মত্ততা-সহকারে স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারের প্রতিকূল।

১১। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে আত্ম-প্রত্যয়ই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল ভূমি। এই ভাবটিও ইওরোপ অথবা এমেরিকার প্রেরিত নহে। তাঁহারদের মধ্যে ঐরূপ ভাব থাকিতে পারে এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন অনেক শাস্ত্রানভিজ্ঞ যুবাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ স্বর্গীয় ভাবটি আর্য্য-শাস্ত্রেরই মন্থিত সুধা। যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে আর্য্যশাস্ত্র না দেখিয়া কেবল ইংরাজিই পড়িয়াছেন তাঁহারাই মনে করেন যে, ইওরোপ ও এমেরিকার ধর্ম্মতত্ত্ববিদেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ পত্তন-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

১২। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে উপাসনার জন্য দেশ কালের নিয়ম নাই। ইহাও অশাস্ত্রীয় নহে। মহর্ষি ব্যাস সর্ব্ব-বেদ মন্থন পূর্ব্বক এই সাররত্ন উদ্ধার করিয়াছেন "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ" যে স্থানে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানেই উপাসনা করিবেক। মুসলমানগণ যেমন সময়ে বদ্ধ, কর্ম্মীরা যেমন সময় এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় নানা নিয়মে বদ্ধ, ব্রাহ্মগণ সেরূপ কোন নিয়মেই বদ্ধ নহেন। ফলতঃ বিষয়াসক্ত বিভ্রান্তচিত্ত এমত অনেক ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যাঁহারা এই কথা দ্বারা প্রশ্রয় পাইয়া ভগবানের নামও করেন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মনাম লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহা অপেক্ষা নিয়মিত

ত্রিসন্ধ্যাকারী কর্ম্মী এবং পঞ্চকাল-ভজনকারী মুসলমান আমাদের অধিক শ্রদ্ধার পাত্র।

১৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্কজ্ঞান অথবা কেবল পাণ্ডিত্যের ধর্ম্ম নহে। উহা জ্ঞান ও প্রেম এই উভয়-মিলিত পন্থা। এ ভাবটিও বিজাতীয় নহে। ঐ ভাবই ভারত-শাস্ত্রের এবং আর্য্যধর্ম্মের সুদৃঢ় ও সুঠাম কলেবর নির্ম্মাণ করিয়াছে। "তদেতৎ প্রিয়ং পুত্রাৎ" পরমেশ্বর পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় একথা ভারত-শাস্ত্রের অমূল্য নিধি। "তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং" সেই দেবতা আমাদিগের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন এই বচন ভারতীয় জ্ঞানের আলোকস্বরূপ এবং

"দৃশ্যতেত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"

"সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা একনিষ্ঠ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করেন" এইরূপ বাক্যসকলই জ্ঞানযোগে উপাসনা করার ব্যবস্থা-স্বরূপ। বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমশূন্য নহে। মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত বেদের এই সার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন যে,—

"নসামান্যাদপ্যুপলব্ধেঃ মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ।"

সামান্য উপাসনায় মুক্তি হয় না—একাগ্রতার সহিত দৃঢ়তর উপাসনাই প্রয়োজন।

"পরেণচ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ।"

প্রীতি আর "তাদ্বিধ্যং" অর্থাৎ প্রীতির অনুকূল প্রিয়কার্য্যই মুখ্য উপাসনা। "একাত্মনঃ শরীরেভাবাৎ" আমাদের জীবাত্মা হইতে ঈশ্বর মুখ্য প্রিয় অতএব অতিস্নেহ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবেক। গীতাতে আছে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে"

ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ অগ্নি দ্বারা শ্রৌত, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ হয়। সেই জ্ঞান লাভ করাও শ্রদ্ধার কর্ম্ম। ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার জ্ঞানলাভে সাধককে তৎপর দেখিলে তিনি আপনাকে সেই সাধকের সম্মুখে প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহারই জ্ঞানালোকে সাধক তাঁহাকে দর্শন করেন। গীতাতে আছে—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং,
দদামি বুদ্ধিযোগংতং যেন মামুপযান্তি তে।"

যে ব্যক্তি সতত যুক্ত থাকিয়া আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহাকে আমি সেই রূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাহার দ্বারা সে আমাকে লাভ করিতে পারে। এতাবতা, শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞান প্রীতি উভয় মিলিত। তাহাই ব্রাহ্ম-সমাজ অবলম্বন করিয়াছেন।

১৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ব্রহ্মই গতি ব্রহ্মই মুক্তি। ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, মুক্তি এমত কোন প্রকার পদার্থ নহে। মুক্তিতে স্বার্থ নাই। পরমেশ্বরকে লাভ করাই মুক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহোচ্চ-ভাব বিজাতীয় বাণিজ্যের ফল নহে। উহা এই দেশেরই শাস্ত্রের বাণী। ব্যাসকৃত অক্ষয় বেদান্ত-হারে অন্যান্য রত্নের মধ্যে এবিষয়ে এই উজ্জ্বল মণিটি দৃষ্ট হয়,—

"অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।" "তস্মাৎ মুক্তস্বরূপং ব্রহ্মাভিন্নং।"

মুক্তি অভিন্নরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ। তবে যে, কখন কখন স্বার্থবশে আমরা ভেদ করিয়া বুঝি সে ঔপচারিক ভেদমাত্র। মুক্তির এমন মনোহর তাৎপর্য্য আর কোন্ দেশের শাস্ত্রে আছে?

ব্রাহ্ম-সমাজ তাহা এই দেশের শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মুক্ত হইলেও ব্রহ্মোপাসনা ক্ষান্ত হয় না বরং তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা তখন* উৎকৃষ্টতররূপে সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মলাভই মুক্তি—সুতরাং তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে তাঁহার উপাসনার আধিক্য হয়। বেদান্তসূত্রে আছে "আপ্রয়াণাৎ তত্রাপিহি দৃষ্টং" "মুক্তাঅপিহ্যেনমুপাসতে" মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক। এই মহোচ্চভাবটি শাস্ত্রহইতেই ব্রাহ্ম-সমাজ পাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ বলেন যে, আত্মা মুক্ত হইলেও লোক লোকান্তরে যাইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে থাকিবেক।

১৫। এতাবতা, আর্য্যধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তঃসার। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা অনেকেই শাস্ত্রের কেবল ব্যবহারিক ভাব মাত্র লইয়াছেন, কিন্তু তাহার গভীরতম পারমার্থিক ভাব সকল এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা ভবতারণের নিকট প্রার্থনা করি যেন এই প্রকারের শাস্ত্রীয়-ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক মহোৎসব সকল ভারত-রাজ্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট জনপদে অভ্যুদিত হইয়া উত্তমাধিকারীগণকে ভারতীয় গভীর জ্ঞানসাগরে প্রবেশাধিকার দেয় এবং যেন সর্ব্বসাধারণের ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত করে। এই উৎসব-ভূমি ব্রহ্মরূপ মনোভাবের দ্বারা নির্ম্মিত। তিনি আমারদের মনস্কামনা সিদ্ধি করিয়া এই সভার কূটস্থ পদে উপবিষ্ট আছেন। আমরা এই শুভক্ষণে তাঁহার পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করি ইতি।

সংখ্যা ১২

—

সায়ংকালের মঙ্গলাচরণ।

—

১। দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর চলিয়া গেল। এই বর্ষচক্রের মধ্যে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের প্রাণসংহারোদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু যে পরমদেবতা অন্যান্য বর্ষে মেঘে অধিষ্ঠান করিয়া পর্জন্য বর্ষণ করেন, তিনি এবার শাসনকর্ত্তৃদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শতধারে প্রজামণ্ডলে অন্ন বস্ত্র পরিবেষণ করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার কৃপায় অপর্য্যাপ্ত বারি বর্ষিত হইয়া এখন বসুন্ধরা শান্তি ও লক্ষ্মীশ্রীতে আবার পরিপূর্ণ হইয়াছে।

২। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম্; কখনও বা উন্নতি, কখনও অবনতি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত একে একে অন্ত হইয়া গেল; আবার বসন্ত আসিয়া মেদিনীকে পুষ্পাভরণে ভূষিত করিল। আবার ধরণীর এই বাসন্তিক মুখশ্রী বর্ষার তমোজালে আবৃত হইবে, এখন প্রকৃতি যে মুখে হাস্য করিতেছেন, সেই মুখে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া দিক্ দেশ প্লাবিত করিবেন।

৩। প্রকৃতি ও মেদিনীর ন্যায় মানবও কখনও সুখ-বসন্তে প্রফুল্লিত কখনও শোকের তমোজালে ম্লান হইতেছেন। আজ যাঁহার সংসার পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী, ধন, ধান্যে, পূর্ণ;

কাল দেখিলাম তাঁহার ভবন শ্মশান হইয়া গিয়াছে। গতবর্ষে যিনি প্রভু ছিলেন এবার তিনি দাস হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে যে দাস ছিল এখন সে প্রভু হইয়া আপনার আধুনিকতার পরিচয় দিতেছে।

৪। এই ভারত-রাজ্যে কালবশে কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে যে সকল শ্রৌতকর্ম্ম ব্যবস্থিত ও প্রচলিত ছিল কলিতে তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে। কলির আরম্ভেও যে সকল স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রচলিত ছিল এখন তাহার অনেক রহিত হইয়া গিয়াছে।

৫। অশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, লাট্টায়ন, ভরদ্বাজ, গোভিল প্রভৃতি ঋষিগণ যে সকল শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও সময়াচারিক-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন; মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ যে সকল স্মৃতিনিবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন এই বর্ত্তমান কালে তাহার একখানি গ্রন্থও ভারতবর্ষের কুত্রাপি সম্যক্ আদর লাভ করে না।

৬। এইক্ষণ অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি অতি প্রাচীন শ্রৌতকর্ম্ম সকলও রহিত হইয়াছে এবং আশ্রমবিহিত আচার সকলও লুপ্ত ও পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে।—এইক্ষণে ব্রাহ্মণেরা হা অন্ন যো অন্ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের বাস্তুভূমি ত্যাগ করত রাজসেবায়, ঘোরতর বিষয় কর্ম্মে এবং শূদ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের অভাবে ভারত-জননী দেবী সরস্বতী বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত গুলিকে ধরাশায়ী মৃত পুত্রের ন্যায় সম্মুখে করিয়া রোদন করিতেছেন। এখন কোথায় ব্যাস, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ চলিয়া গিয়াছেন; কোথায় শঙ্করাচার্য্য,

রামানুজস্বামী, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রস্থান করিয়াছেন—কে আর দেবীর মুখ উজ্জ্বল করিবে।

৭। এইক্ষণ ক্ষত্রিয়কুল লোপ হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-রাজস্বাধীনতা অস্তগমন করিয়াছে। ঋষি, আচার্য্য এবং ধর্ম্মশাসন অভাবে দিন দিন আর্য্যধর্ম্ম ম্লান হইতেছে। তথাপি এখনও যে আর্য্যধর্ম্মের কিঞ্চিৎমাত্রও থাকিয়া হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছে ইহাই বিস্তর।

৮। এখনও বন্ধুগণ! মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর, একবার মনের সঙ্গে ভারত-বাগ্‌বাদিনীর পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা কর। সেই সকল শাস্ত্রের জ্ঞানলাভে একচিত্তে যত্ন কর; এই এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এমন সার ধনকে লাভ করিবে যাহা কালেতে ধ্বংস হয় না, প্রলয়ে লয় পায় না।

৯। ধন্য সুধামাখা ব্রহ্মনাম যাহা এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয়। ব্রহ্মনাম ভারতবর্ষের চিরন্তন ধন। ব্রহ্মনাম ভারতীয় শাস্ত্র-সাগর-মন্থিত পরম সুধা। বন্ধুগণ! সেই মহাসুধা লাভ করিবার নিমিত্তে একবার ভারত-সরস্বতীর শরণাপন্ন হও। পিতৃপুরুষদিগের কীর্ত্তিসকল কালবশে অনেক লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন যে সকল সার তত্ত্ব আছে তাহা স্বহস্তে ধ্বংস করিয়া স্বীয় ক্ষিপ্ততার পরিচয় দিওনা।

১০। শাস্ত্রের অসংখ্য অসংখ্য ব্যবস্থা এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মনাম যেরূপ তেজে আদিযুগে ঋষিবাক্য হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা সেইরূপ তেজেই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।

১১। ব্রহ্মনামরূপ স্পর্শমণি ভারতের তাবৎ শাস্ত্রকে হেমবর্ণে সুশোভিত করিয়াছে, ব্রহ্মনামই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-কুলকে উন্নত করিয়াছিল, আবার সেই নামের অভাব এখন ব্রাহ্মণ বর্ণকে শূদ্রাস্ত করিয়া রাখিয়াছে। বন্ধুগণ! সেই পরশ-রতনকে অবজ্ঞা করিওনা। তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল জীবনকে অক্ষয় করিয়া লও।

১২। এই ভারতবর্ষে আমারদের আর কিছুই নাই, কেবল আমারদের শাস্ত্রের গৌরব ব্রহ্মনাম জাগ্রত রহিয়াছে। শাস্ত্রকে আদর করিয়া ব্রহ্মনাম লাভ কর এবং ব্রহ্মনাম হৃদয়ে ধরিয়া শাস্ত্রকে সম্মান প্রদান কর।

১৩। যেমন নয়নের নিমেষ ফেলিতে ফেলিতে এই এক বৎসর চলিয়া গেল, হয় ত এমনি নিমেষ মাত্রে জীবন চলিয়া যাইবে। জীবনের সারধন সেই অমূল্য রত্নকে এই বেলা উপার্জ্জনপূর্ব্বক হৃদয়ে রাখিয়া দেও। হৃদয়ের জ্যোতিকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিয়া অন্ধ হইয়া থাকিওনা।

১৪। সেই ব্রহ্মনাম একবর্ষান্তে আমাদিগকে এই যজ্ঞ-প্রাঙ্গণে আহ্বান করিয়াছে। সেই নামের সংস্পর্শে আজ আমাদের হৃদয় পবিত্র হইল। পবিত্রহৃদয়ে তাঁহাকে জনমের মত গ্রহণ কর। জীবন গেলেও সেই দরিদ্রের ধন অমূল্য মণিকে হৃদয়ে রক্ষা করিবে। তাঁহা অভাবে হৃদয় শ্মশান-সদৃশ, সংসার মরুভূমি। তিনি দেবগণের শিরোভূষণ, আমারদের হৃদয়ের দীপ্তি। যেন প্রমত্ত হইয়া সে ধনে বঞ্চিত হইও না ইতি।

সংখ্যা ১৩

সায়ংকালের বক্তৃতা।

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের ঐক্যানৈক্য সম্বন্ধ।

১। যে আদিযুগে ভারত-রাজলক্ষ্মী ভারত-কমলাসনে উপবিষ্টা ছিলেন সেই সময় হইতেই ভারতীয় ধর্ম্ম-রাজ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে আর্য্য-সমাজে ইন্দ্রাগ্নিবায়ুবরুণের উপাসনা এবং তাঁহাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত ছিল। যখন আর্য্যদিগের মধ্যে সেই যাগযজ্ঞের ধূম ভেদ করিয়া ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন জ্ঞানাপন্ন ঋষিগণ উক্ত জ্যোতিঃ দৃষ্টে মোহিত হইয়া ব্রহ্মকেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের সারতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তখন ক্রিয়াকর্ম্মের বাহ্য আকারে বা ফল-কামনায় যাহাতে লোকে আবদ্ধ না থাকে—যাহাতে ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ মিত্র প্রভৃতি দেবগণের প্রকাশক ও বরণীয়-রূপে ব্রহ্মকে সকলে দর্শন করে তাঁহারা তাহারই ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন।

২। তখন তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের সত্তা ও জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল ব্রহ্মের উদ্দেশেই তাঁহাদের পূজা। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া

তাঁহাদের যে আরাধনা তাহা অবিদ্যামাত্র। ঐ সকল দেবগণ স্বতন্ত্র দেবতা নহেন, কিন্তু কেবল প্রকৃতির দীপ্তিমান্ আবির্ভাবস্বরূপ। কেবল ব্রহ্মের আবির্ভাবেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রহ্মের আবির্ভাবেই তাঁহাদের জীবন। অতএব তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কৃত হয় এবং বেদেতে তাঁহাদের পূজার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ব্রহ্মপর—ব্রহ্মেরই পূজা। এই হেতু বেদ স্বয়ংই ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বতন্ত্র দেবত্ব খণ্ডন করিয়া তাঁহাদের আবির্ভাবেতে ব্রহ্মেরই আবির্ভাব জ্ঞাপন করিলেন।

৩। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে; "ক্ষেম ইতি বাচি।" বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিতভাবে ক্ষেমরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। "যোগক্ষেমইতি প্রাণাপানয়োঃ" প্রাণাপানে প্রতিষ্ঠিতভাবে ক্ষেমরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। "কর্ম্মেতিহস্তয়োঃ" হস্তেতে কর্ম্মরূপে তাঁহার পূজা করিবে। "গতিরিতি পাদয়োঃ" তাঁহাকে পদের গতিশক্তিস্বরূপে উপাসনা করিবে। "বিমুক্তিরিতিপায়ৌ" পায়ুদেশে (অর্থাৎ মূলাধারে) তাঁহাকে বিমুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতভাবে পূজা করিবে। "ইতি মানুষী সমাজ্ঞা" ইহাই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উপাসনা। "অথ দেবীঃ" অনন্তর দেবতাতে তাঁহার উপাসনা করিবেক। যথা

> "তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ, বলমিতি বিদ্যুতি, যশইতি পশুষু,
> জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু, প্রজাতিরমৃতমানন্দইত্যুপস্থে,
> সর্ব্বমিত্যাকাশে।"

তাঁহাকে বৃষ্টিধারায় তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুধনে যশঃরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতি রূপে, শরীরে প্রজা, মুক্তি ও

আনন্দ রূপে এবং আকাশে সমস্ত বস্তুর প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করিবেক। "সযশ্চায়ং পুরুষে" তিনিই প্রত্যেক জীবেতে। "যশ্চাসাবাদিত্যে" তিনিই সূর্য্যেতে। "সএকঃ" তিনি একই। সর্ব্বত্রে তিনিই প্রাণস্বরূপে, সত্তারূপে, এবং প্রকাশরূপে বর্ত্তমান আছেন।

৪। তলবকার উপনিষদে আছে যে,

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরিতিমুচ্যধীরাঃ প্রেত্যাস্মা-ল্লোকাদমৃতাভবন্তি।"

পরমেশ্বর শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু। অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশে ঐ সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশ পাইতেছে। পাপকর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে জানিলে ধীরেরা লোকান্তরে অমৃত হয়েন।

৫। অতএব বেদেতে ইন্দ্রাদি যত দেবগণের, প্রকৃতির যত প্রভাবের, মানবদেহের যত অঙ্গের উপাসনার নিদর্শন বা ব্যবস্থা আছে তাহা সকলই ব্রহ্মপর। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পরিমিত প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা বেদের উদ্দেশ্য নহে। তবে লোকে ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হইয়া, কেবল প্রথা ও ফল-কামনাবশতঃ, অথবা নিয়মের বশীভূত বা অকরণজন্য প্রত্যবায় হইতে অব্যাহতি-লাভাশয়ে ঐ সকল দেবতাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে পরিমিতভাবে পূজা করিতে পারে, তাহাতে বেদের দোষ হয় না। কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মবোধ-বিহীন ফলকামনা-বিশিষ্ট অন্ধ উপাসনা যে, ব্রহ্মের উপাসনা নহে তাহা বেদেতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্যের যিনি বরণীয়-

স্বরূপ সূর্য্য-ধ্যান দ্বারা তাঁহারি উপাসনা করিবেক, কিন্তু সামান্য সূর্য্যের উপাসনা নহে। বাক্যের ও প্রাণের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্ম, বাক্য ও প্রাণের উপাসনা-বিধিতে, তাঁহারই উপাসনার উদ্দেশ্য। সামান্য কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর অথবা শরীরস্থ প্রাণবায়ু সকলের উপাসনা উদ্দেশ্য নহে। যদিও শাস্ত্রের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য কিন্তু পূর্ব্বকাল হইতেই অনেক লোক ব্রহ্মবোধ-বিহীন হইয়া, দেবগণকে স্বতন্ত্র দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছেন। যেখানে ঐ প্রকার ব্রহ্মবোধ নাই, সেইখানেই উপাসনা ও কর্ম্মসকল ফলকামনা-বিশিষ্ট। কামনাই তথায় উদ্দেশ্য, ব্রহ্ম উদ্দেশ্য নহেন। সে সকল দেবতা তাদৃশ স্থলে প্রাণহীন। কেন না, উপাসক তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সুতরাং বেদে কহিয়াছেন

"যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে তদেব
ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

শরীরস্থ প্রাণবায়ু যাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেই প্রাণের প্রাণস্বরূপ, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়া জানিবে, কিন্তু যে সকল প্রাণ-বায়ুকে লোকে ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য হইয়া "প্রাণায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সামান্যতঃ পূজা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

৬। অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,

"সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি"

সকল বেদ সেই পূজনীয় ব্রহ্মকে কীর্ত্তন করে, সকল তপস্যা তাঁহাকেই ব্যক্ত করে। বেদেতে যত দেবতার পূজার বা যজ্ঞাদিকর্ম্মের নিদর্শন আছে সকলই ব্রহ্ম-পূজার অবলম্বন

মাত্র। অবলম্বন ব্যতীত এ সংসারে পরমেশ্বরের উপাসনা প্রায় সম্ভব হয় না। আকাশ তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; পর্ব্বত সকল ঊর্দ্ধমুখী হইয়া তাঁহাকে কহিতেছে; মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, সকলেই তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছে। বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠারূপে তাঁহাকেই ব্যক্ত করিতেছে। অতএব শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, যজমান যখন "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" বা "ওঁ সোমায় স্বাহা" বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন তখন যেন মনে রাখেন যে, তাহা সমস্তই ব্রহ্মপক্ষে যাইতেছে।

৭। পরমারাধ্য ব্যাসদেব স্বীয় উত্তরমীমাংসা-শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ" ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। অতএব সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতে। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল পরম্পরা ব্রহ্মকেই প্রকাশ করেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আশ্রয়রূপে ব্রহ্মকেই দৃষ্টি করিবেক।

৮। যদি বল শাস্ত্রের এমত তাৎপর্য্য সত্ত্বেও কেন লোকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেবে, সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্ব অঙ্গে, সর্ব্ব শক্তিতে, সর্ব্বসম্পত্তিতে, সর্ব্বপ্রকার উপাসনায় ব্রহ্ম-দৃষ্টি না করে; তাহার উত্তরে গীতাতে লিখিয়াছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া সকল যদিও বিষতুল্য এবং যদিও ভগদ্ভক্তিভিন্ন মুক্তি হয় না, কিন্তু "অবিপশ্চিৎ" অল্পমেধাবিশিষ্ট মূঢ়েরা ঐরূপ ক্রিয়াতেই আবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসে, তাহারা মনে

করে ঐরূপ ক্রিয়ার অতীত অন্য ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রাপ্তব্য নাই। এই কারণে কামী পুরোহিতগণ আপাততঃ পুষ্পিত-বৃক্ষ-সদৃশ শোভমান ও শ্রেয়মান রমণীয় বাক্যের দ্বারা ঐ সকল অবিবেকী ব্যক্তিদিগকে উক্ত ক্রিয়া কর্ম্মের ফলশ্রুতির উপদেশ করেন। অতএব যাহারা কামনাতে আক্রান্ত, অনিত্যস্বর্গভোগ যাহাদের বোধে পরমপুরুষার্থ, সেই সকল ব্যক্তি জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ বাক্য সকল এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির উপায়স্বরূপে বাহুল্য-ক্রিয়ার উপদেশ করেন। উক্ত ভোগ ঐশ্বর্য্যে আসক্ত, এবং ঐরূপ পুষ্পিতবাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের সমাধি অসম্ভব। অর্থাৎ পরমেশ্বরেতে তাহাদের চিত্তের একাগ্রতারূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না।

৯। আমরা সকলকে বিনয়পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি সাধনে অনুরোধ করিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ঈশ্বরভক্তি ভারতের চির-সম্পত্তি। ভারত-শাস্ত্র সকল ব্রহ্মজ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা কোন শাস্ত্রের, কোন ক্রিয়ার, কোন নিয়মের শুভ অর্থ বোধগম্য হয় না। বেদত্রয়মন্থিত প্রণব ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞাপন করিতেছে; ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক এই ত্রিলোক-প্রতিপাদিকা ব্যাহৃতি ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছেন; বেদমাতা গায়ত্রী ব্রহ্মজ্ঞানকে কহিতেছেন। বেদ সকল, স্মৃতিশাস্ত্র সকল এবং তন্ত্রসকল সমস্ত ক্রিয়া, কর্ম্ম, পূজা, অর্চ্চার সাররূপে ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রচার করিয়াছেন; এবং পুরাণ সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং নানা প্রকার আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানেরই সারত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব হে তাত ও বন্ধুগণ অদ্যকার এই ব্রহ্ম-সংসতে ভারতীয় শাস্ত্র-রত্নাকর-মন্থিত, কূটস্থ ও তুরীয়-পদবাচ্য সুধা-সম ব্রহ্ম-বীজমন্ত্রের কবজ গ্রহণ করিয়া অভয় লাভ কর ইতি।

গীতা-শাস্ত্র।

সংখ্যা ১৪

দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ।

রবিবার, ১৫ই চৈত্র ১৭৯৬ শক।

জ্ঞানধর্ম্ম কখনই ভারতে ক্ষত্রধর্ম্মের বাধক হয় নাই।

১। অনেকের সংস্কার এই যে, ভারতীয় শাস্ত্রে কেবল হোম, যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতির উপদেশ আছে এবং ভারত-বাসীগণ কেবল সেই সকল ক্রিয়াতেই তৎপর। তাঁহারা না জানিয়া শুনিয়া মনে করেন যে, ঐ সব ক্রিয়াতে ভারতের অধিকাংশ লোক বহু দিন ধরিয়া রত থাকায় তাঁহারা কখন যুদ্ধে সুদক্ষ হন নাই। কিন্তু ভারতের পূর্ব্ব বিবরণ ও শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য আলোচনা না করাতেই ঐরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

২। অনেকেই স্মরণ করিতে পারিবেন যে, ইক্ষ্বাকু অবধি জন্মেজয় পর্য্যন্ত রাজগণের সময়ে যখন ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিক আলোচনা ছিল বরং সেই সময়েই আর্য্যেরা সমরদর্পে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ কেবল যুদ্ধেতেই উৎসাহ প্রদান করিত। ইন্দ্রাগ্নি বায়ুবরুণের পূজা অধিকাংশতঃ যুদ্ধ-কামনাতেই অনুষ্ঠিত হইত। আর্য্যেরা সমর-পরাক্রম কামনা করিয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের দ্বারে হত্যা দিতেন। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জয়ী হইবার নিমিত্তেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতেন এবং

সমরে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্যই রামচন্দ্র মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার নিমিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগবুদ্ধিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

৩। ভারতীয় শাস্ত্রের আদেশ যে, ন্যায়-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেও অক্ষয় স্বর্গ হয়। যোদ্ধারা সাধারণতঃ এই বিশ্বাসে সমরে অবতরণ করিতেন। প্রাণের ভয়, স্ত্রী পুত্রের মমতা, ঐ সৎকর্ম্মে বাধা দিত না। যদিও সাধারণ লোকের এই ভাব ছিল, কিন্তু যদি ঐ স্বর্গভোগের আশা স্বার্থ বলিয়া গণ্য হয় এজন্য জ্ঞানী যোদ্ধারা কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুরোধেই ঘোর-তর সমরে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বর্গভোগের আশা দেখাইয়া অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন যে, অর্জ্জুনের উন্নত-বুদ্ধির অধিকারে ঐ আশা মিষ্ট লাগিল না; তখন কহিলেন

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

অর্থ—"যদ্যপি সুখ, দুঃখ; জয়, পরাজয়; লাভ, অলাভ সমান জ্ঞান করিয়া অবশ্য-করণীয়-কর্ম্ম-জ্ঞানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তাহে কখনই পাপ হইবে না।" কিন্তু জ্ঞানী ভিন্ন অন্যের সে বুদ্ধিতে অধিকার হয় না; গীতাশাস্ত্রের সর্ব্বত্রেই তাহার আভাস রহিয়াছে।

৪। বেদসংহিতা ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যাগ যজ্ঞের সহিত যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহা বর্ণিত আছে তাহা বুঝা কঠিন নহে, কিন্তু আত্মজ্ঞান ও যোগাঙ্গের সহিতও যে তাহার সম্বন্ধ তাহা বুঝা সকলের সাধ্য নহে। গীতাশাস্ত্রে ক্রমে ক্রমে আত্ম-বিজ্ঞান ও কর্ম্মযোগের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

৫। অনেকে মনে করিতে পারেন গীতাতে এমন অনেক স্থল আছে যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ। কিন্তু সেরূপ আশঙ্কা করিয়া পরমোপকারী গীতাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। আত্মতত্ত্ব, যোগ ও ব্যবহার শিক্ষাদানে গীতাই সকল শাস্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ। বেদান্ত ব্রহ্মজ্ঞানই শিক্ষা দিয়াছেন, জৈমিনি যাগ যজ্ঞেরই উপদেশ করিয়াছেন, সাংখ্য পুরুষ প্রকৃতিরই মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, ন্যায় বাক্‌পটুতা শিখাইয়াছেন, পুরাণে পরমার্থ ও ব্যবহার মিশ্রিত আখ্যান প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্ত্রে কুলাচার, বীরাচার ও সাধনা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু গীতা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ক্ষত্রধর্ম্মের আলিঙ্গন সম্পন্ন করিয়াছেন। বেদান্তের পরমার্থতত্ত্ব দ্বারাই যে ক্ষত্রধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয় তাহাই দর্শাইয়া গীতা ভারত-গগণে পুরুষকাররূপ মহামিহির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞান নষ্ট হইলে তাহার মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। যাঁহাদের ঘরে এমন স্বর্গীয় দর্পণ রহিয়াছে তাঁহারা সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া যে সহসা শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াতে দোষারোপ করেন তাহা অতি দুঃখের বিষয়।

৬। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আর্য্যেরা যদি কখন যুদ্ধ বিক্রম দর্শাইয়া থাকেন তাহা কেবল তাঁহাদের স্বদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অতএব তাঁহাদের সে বিক্রম প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু এরূপ মনে করা অসঙ্গত। তাঁহারা কোন বিদেশকে করভুক্ত করিয়াছিলেন কি না, সে বিচারে এখন কাজ নাই; কেবল এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ভারতবর্ষ যত বড় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প্রাচীন রোমরাজ্যের পরিমাণ তাহা হইতে অধিক ছিল না এবং এক রূষ

দেশ ব্যতীত এখন ভারতাপেক্ষা কোন রাজ্যের অধিক আয়তন নাহি। এতাদৃশ ভারতক্ষেত্র পূর্ব্বে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যক্ষ, রক্ষ, দানব, কিরাত, আভীর প্রভৃতি আদিম নরবংশের শাসনে ছিল। তাহারা আর্য্যগণের অনিষ্ট করিত, সুতরাং আর্য্যেরা অগ্রে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একে ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ, আবার সম্মুখে এত শত্রু, বিশেষতঃ সুখ সম্পত্তির সমস্ত প্রকার উপাদানই ভারতে ছিল সুতরাং ভিন্ন দেশাক্রমণে তাঁহাদের অবসর ও বাসনা হয় নাই।

৭। আর্য্যেরা যে যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায় সমস্ত যুদ্ধই প্রাগুক্ত-প্রকার আদিম নর-জাতির সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। অতি অল্প স্থলেই স্বজাতির সহিত যুদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে কুরু-পাণ্ডবীয় সমরই প্রধান। ফলে, তেমন যে আত্মীয়ে আত্মীয়ে যুদ্ধ তাহাও ভারতীয় শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। যে করুক্ষেত্র পাণ্ডবগণের আত্মীয়-শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছিল তাহাও ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভে বান্ধবগণের রুধির-পাত আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুনের মনে পাপস্পর্শ হইয়াছিল, কিন্তু গীতাশাস্ত্রে তাহা সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ উপদেশ দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। গীতার সেই সকল উপদেশ মায়া, মোহ বিনাশের তীক্ষ্ণাস্ত্রস্বরূপ; নিস্বার্থ বিষয়-বিদ্যা এবং বিষয়াতীত পরমার্থ-বিদ্যার বীজমন্ত্রস্বরূপ এবং স্বর্গীয়ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসারধর্ম্মের যোগস্বরূপ। অতএব হে ভারত-সন্তানগণ! গীতা অধ্যয়ন কর, নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন ব্যবহার দ্বারা এ ভারতে কখন সুকৃতি সঞ্চয় করিতে পারিবে না ইতি।

সংখ্যা ১৫

দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ

রবিবার

২৭শ্রাবণ ১৭৯৭শক।

গীতা এবং তাহার উদ্দেশ্য।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি বিখ্যাত শাস্ত্র। ইহা মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় অবধি একচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু ঐ সমস্ত ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম একাদশ অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়া চতুর্ব্বিংশাবধি একচত্বারিংশ পর্য্যন্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নামে প্রচলিত। উহার মধ্যে ৬৯৮ সংখ্যক শ্লোক আছে। তন্মধ্যে শ্রীধরস্বামী প্রথমাবধি সমুদয় শ্লোকের এবং পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের একাদশ শ্লোকাবধি অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সমুদয়ের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রচলিত গীতা আরম্ভেই "শাঙ্করভাষ্যং উপক্রমণিকা" নামে কিঞ্চিৎ ভূমিকা এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের দশম শ্লোকের পর "শাঙ্করভাষ্যং" নামে আর কিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে। উহার মধ্যে প্রথমটি আরোপিত এবং দ্বিতীয়টি প্রকৃত বোধ হয়। পরীক্ষা দ্বারা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

২। শঙ্করাচার্য্যের লিখিত তাৎপর্য্য ভাষ্য নামে এবং স্বামিকৃত তাৎপর্য্য টীকা নামে অভিহিত হয়। এই দুই

তাৎপর্য্য ব্যতীত আনন্দগিরি সমুদয় অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিস্তীর্ণ টীকা করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্য, স্বামীকৃত টীকা, আনন্দগিরি-টীকা এবং বঙ্গভাষায় তাৎপর্য্যসম্বলিত অষ্টাদশ-অধ্যায়-যুক্ত সমুদয় গীতাশাস্ত্র খানি মানকরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হিতলাল মিশ্র মহাশয় কর্ত্তৃক এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের যত্নে ১৭৮০শকে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মহৎকার্য্যের দ্বারা বঙ্গ প্রদেশের যে কতদূর উপকার হইয়াছে তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। উপরি-উক্ত ভাষ্য ও টীকাসমূহ ব্যতীত গীতা শাস্ত্রের আরো অনেক টীকা আছে। তাহার এক খানিও মুদ্রিত হয় নাই।

৩। গীতাশাস্ত্র ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রে আদরণীয়। উপনিষদের বিস্তর বচন ইহাতে অবিকল আছে। উপনিষৎ-শাস্ত্রের, বেদান্তসূত্রের, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের, স্মৃতি ও পুরাণ-শাস্ত্রীয় জ্ঞানভাগের সংক্ষেপ মর্ম্ম উহাতে সন্নিবেশিত আছে। এই মহাশাস্ত্র উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র সৃষ্টির পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ উহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আছে; যথা,—

"ঋষিভির্বহুধা গাতংছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ॥"

অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদে ছন্দে ও মন্ত্রে ও যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তসূত্রাদি দ্বারা বিবিক্তরূপে বহুধা নিরূপিত হইয়াছে। অতঃপর ইহা সাংখ্য-দর্শনেরও পশ্চাৎ প্রকাশিত; যথা উক্ত অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে আছে—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখনাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"
(উচ্যতে কপিলাদিভিঃ ইতি স্বামী)

অর্থাৎ কপিলাদি সাংখ্যদর্শন-কারেরা প্রকৃতিকে শরীর ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-নির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখ-দুঃখ-ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতাবতা, বেদান্ত-সূত্রের—সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসারও আর সাংখ্যদর্শনের পশ্চাৎ-কালে এই শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন, বেদান্ত এবং সাংখ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান হয়; কেন না, শেষোক্ত উভয়দর্শনেই প্রথমোক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের পূর্ব্ব-বর্ত্তিত্ব-জ্ঞাপক উল্লেখ আছে। সুতরাং ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত ও সাংখ্য এই পঞ্চদর্শনই গীতার পূর্ব্বকার। কেবল পাতঞ্জল সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

৪। এই গীতাশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং অর্জ্জুন শ্রোতা-রূপে কথিত হন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণের সহিত ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে * মহাসমরে অবতরণ পূর্ব্বক যখন

* কুরুক্ষেত্র—মনুকন্যা ইলা হইতে ২৮ পুরুষ পরে পুরুবংশে অজমীঢ় ভূপতি জন্মেন। তাঁহার ধূমিনী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ঋক্ষ; ঋক্ষ হইতে সম্বরণ জন্মিয়া কুরুবংশের সংস্থাপক হয়েন। তাঁহার কুরুনামে পুত্র হয়। কুরুরাজ দিল্লির কিঞ্চিদুত্তরাংশে বন পরিষ্কার পূর্ব্বক এক দেশ স্থাপন করেন। তাহার নাম কুরুজাঙ্গল অথবা কুরুক্ষেত্র। ঐ স্থান অতি বিস্তৃত। উহার উত্তরভাগ যাহা স্থানেশ্বর ও পাণিপথের নিকট, সরস্বতী নদীর দক্ষিণ ও দৃষদ্বতীর উত্তর তাহাই কুরুক্ষেত্র তীর্থ নামে এখনও বর্ত্তমান আছে। সেই স্থানেই পূর্ব্বকালে পরশুরাম রামহ্রদপঞ্চক খোদন করেন এবং পশ্চাৎ কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ হইয়াছিল। পশ্চাৎকালে ঐ স্থানেই মহারাষ্ট্রীয় নরপতিগণের সহ হিন্দুস্থানের রাজাদিগের এক মহাসমর হয়। এই ক্ষেত্র বহু সৈন্যের সমাবেশ-যোগ্য বিধায় পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতীয় সমরসমূহের মহারঙ্গভূমি হইয়া আছে। ঐ স্থানে

মহাবীর "ধনঞ্জয় উন্মীলিত-নেত্রপাত-পূর্ব্বক দেখিলেন, পিতামহ, পিতৃব্য, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, আচার্য্য, মাতুল, শ্বশুর প্রভৃতি যাবতীয় আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ যুদ্ধার্থী হইয়া রণস্থলে সমাগত হইয়াছেন" তখন তিনি শোকে অভিভূত হইয়া

"নযোৎস্যইতিগোবিন্দমুক্তাতূষ্ণীংবভূব হ"

আমি যুদ্ধ করিব না, এই বাক্য শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়া মৌনাবলম্বী হইলেন।—এস্থানে স্বামী লিখিয়াছেন

"দেহাত্মনোরবিবেকাৎ অস্যৈবংশোকোভবতীতি
তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ।"

অর্থাৎ দেহ এবং আত্মার অবিবেকতাবশতঃ অর্জ্জুনের শোক হইয়াছিল, বিবেক জন্মাইয়া যুদ্ধে নিয়োগ করণার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই গীতা-শব্দের বাচ্য।

৫। গীতাতে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রকৃতিপুরুষ, বিবেক যতই উপদেশ থাকুক; অর্জ্জুনকে যুদ্ধে মতি-প্রদানই উহার

হিরণ্যবতী নামে এক পবিত্রজলপূর্ণ তটিনী ছিল। তাহারই তীর দিয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শিবির স্থাপিত হয়। সৈন্য-রক্ষার নিমিত্তে শিবিরের অপর পার্শ্বে এক সুদীর্ঘ গভীর পরিখা খোদিত হয়। কেশবের তত্ত্বাবধারণে তথা ভারে ভারে কাষ্ঠ, মধু, ঘৃত, ফল মূল প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য, অশ্ব গজাদির ভক্ষ্য দ্রব্য ইত্যাদি তাবৎ আবশ্যকীয় দ্রব্যই রাশি রাশি সংগ্রহ হইয়াছিল। সেনাপতিগণের নিমিত্তে তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ রথ নির্ম্মাণ হইতে থাকিল এবং বহুসংখ্যক বহুদর্শী অস্ত্রচিকিৎসক ঔষধ প্রভৃতি লইয়া নিযুক্ত রহিলেন। স্থানে স্থানে ধনুঃ, বাণ, বল্লম, গদা, কুঠার ও অন্যান্য নানাবিধ সমরাস্ত্র সকল স্তূপায়মান রহিল এবং সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ, গজ সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। (ধীরাজবাহাদুরের মঃ ভাঃ আঃ পঃ ১৫৫ পৃঃ, উইলসনকৃত সংস্কৃত সাহিত্য ১খঃ ৩০৮ ও ২খঃ ৩০৯পৃ, ঐ জনের বিষ্ণুপুরাণ ২খঃ ১৪৩পৃঃ, কাশিরাম দাসের উদ্যোগপর্ব্ব যুদ্ধসজ্জা, এবং ধীরাজ বাহাদুরের মঃ ভাঃ উদ্যোগ পঃ ৩২১পৃঃ)

মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্জ্জুনকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করিবার নিমিত্তে গীতাতে যোগ কথিত হয় নাই, কিন্তু শোক ত্যাগপূর্ব্বক বল বীর্য্য সহকারে যুদ্ধ করিবার জন্যই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও ক্রিয়া-যোগ কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বাপহারী, পাণ্ডুকুল-বিদ্বেষী, পৃথিবীর কণ্টক-স্বরূপ কৌরবগণকে উৎসন্ন করা প্রয়োজন হইয়াছিল। তাদৃশ-স্থলে মমতা-প্রকাশ—দয়া-প্রকাশ—উহাদের গুণ-স্মরণ কাপুরুষত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত উক্ত যুদ্ধের বাধস্বরূপ শোক নষ্ট হয় না; এজন্য প্রথমেই আত্মার অমরত্ব বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি কহিলেন যে, আমরা সকলেই দেহ-বিনাশের উত্তরকালে নিত্য-আত্মা-স্বরূপে অবস্থিতি করিব, এই বর্ত্তমান দেহে যেমন বাল্য, যৌবন, জীর্ণাবস্থা ক্রমে দেখা দেয়, আর তাহার পর পর অবস্থা প্রাপ্তে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার স্মৃত 'অহং' ইত্যাকার জ্ঞান বিকার প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ 'সেই আমি' বোধ থাকে; তদ্রূপ এই দেহ নাশের উত্তর কালে লিঙ্গদেহ-নিবন্ধন আত্মার স্বরূপ ও পূর্ব্ব সংস্কার সম্বন্ধে অন্যথা-ভাব হয় না। এই আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না এবং ইনিও প্রকৃত প্রস্তাবে কাহাকে হনন করেন না *। শস্ত্র ইহাঁকে ছেদন করিতে পারে না, পাবক দহন করিতে পারে না, আপ গলিত করিতে পারে না এবং মারুত শোষণ করিতে পারে না।

---

* জীবাত্মা হননের কর্ত্তা নহেন, ইহা বুঝা আপাততঃ যদিও কঠিন; কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা অসঙ্গত নহে। বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্র দ্বারা বিচার করিলে উহার সুন্দর তাৎপর্য্য লাভ হয়। আমার সৃষ্টি ও বেদান্তপ্রবেশ গ্রন্থে স্থলবিশেষে আমি এইরূপ বিচারের আভাস দিয়াছি। উক্ত গ্রন্থদ্বয় যন্ত্রালয়ে প্রেরিত হওয়ায় সে সকল স্থল নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

৬। ইত্যাদি জ্ঞান-যোগ উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন

"দেহীনিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

দেহ নষ্ট হইলেও নশ্বর-দেহ-স্থিত সেই আত্মা নিত্য এবং অবধ্য; অতএব জ্ঞাতিগণের নাশে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ তুমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধকার্য্য তোমার স্বধর্ম্ম। ধর্ম্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা তোমার শ্রেয়োজনক আর কি আছে? এই যুদ্ধ তোমার পক্ষে অবারিত-স্বর্গদ্বার-স্বরূপ জানিবে।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং"

যদি এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যুও হয় তবে তোমার স্বর্গ-বাস হইবেক।

"জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং"

আর যদি জয় হয় তবে পৃথিবী ভোগ করিবে;

"তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"

অতএব যুদ্ধ নিশ্চয়পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। এ উপদেশও যদি মনোনীত না হয় তবে লাভালাভ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া "এই যুদ্ধ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য" এইরূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর। তাহাতে কোনরূপ স্বার্থজন্য তোমাতে পাপস্পর্শ হইবে না।

৭। এইরূপে প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞান, পরে স্বর্গাদি-ভোগের প্রলোভন, পশ্চাৎ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপদেশ করিয়া অবশেষে কহিয়াছেন এই সকল উপদেশ যদি তোমার প্রীতিকর না হয়—যদি প্রাগুক্ত জ্ঞানযোগ ধারণে অক্ষম হও তবে ঈশ্বরোদ্দেশে এই যুদ্ধ কর। এই শেযোক্ত-প্রকার উপদেশের অভিপ্রায়

এই যে, কুরুবংশ বড় প্রজা-পীড়ক ও পাণ্ডবগণের অনিষ্ট-কারক; সকলেই তাহাদের বিনাশ প্রার্থনা করিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে বিনাশ করা ঈশ্বরীয় কার্য্য; অতএব তাদৃশ বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর। এই স্থানে এই যুদ্ধরূপ সাংসারিক কর্ম্মটি উপলক্ষ করিয়া ২ অধ্যায়ের ৩৯ অবধি শেষ (৭২) শ্লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া কর্ম্মই ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করার কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। সেরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে ফল-কামনার অভাববশতঃ কর্ম্মজন্য বন্ধন উৎপন্ন হয় না। শ্রৌত, স্মার্ত্ত, গার্হস্থ্য, শারীরিক প্রভৃতি তাবৎ কর্ম্মই ঐ প্রকারে নির্ব্বাহ করার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পদে পদে কাম্য কর্ম্মকে নিন্দা, কামনার মূলস্বরূপ ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায় এবং যাঁহাদের কর্ম্ম করার প্রয়োজন নাই এমত তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

৮—১১। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের শোক দূর করিবার জন্য জ্ঞান-যোগ, স্বর্গের লোভ, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, কর্ম্ম-যোগ এবং শেষোক্ত কর্ম্ম-যোগের মধ্যেও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যত প্রকার উপদেশ দ্বিতীয়াধ্যায়ের একাদশ শ্লোকাবধি অন্তিম (অর্থাৎ ৭২) শ্লোক পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন; তন্মধ্যে কাম-কর্ম্ম-সংসার-বীজ-স্বরূপ, মায়া-মোহ-বিনাশক তত্ত্বজ্ঞানেই অর্জ্জুনের প্রীতি হইল। জ্ঞান এমনি আশ্চর্য্য পদার্থ যে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবা মাত্রে তাহার মনোহারিতাতে নর-চিত্ত আকৃষ্ট হয়। অতএব অর্জ্জুনের শোক দূর ও যুদ্ধস্পৃহা উদ্রেক জন্য প্রথমেই যে জ্ঞান-যোগ ও পরে কর্ম্ম-যোগের মধ্যে মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের যে প্রশংসা ও তদুপলক্ষে কর্ম্মের যে নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছিল

তাহাই পুনশ্চ আবার যুদ্ধের বাধ হইল। কেন না, তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন।

"জ্যায়সীচেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥"

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা যদি তোমার মতে তত্ত্বজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হইল তবে কি জন্য "উত্তিষ্ঠ" "যুদ্ধস্ব" বলিয়া আমাকে ঘোর-হিংসাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছ? অতএব এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল।

১২। উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে, জ্ঞান-যোগ আর কর্ম্ম-যোগ এই উভয়ের একই ব্রহ্মনিষ্ঠাতে উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে॥"

আত্মাতেই যাঁহার রতি, আত্মাতেই যাঁহার তৃপ্তি, আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ; সুতরাং ভোগাদিতে অপেক্ষা-রহিত তাদৃশ ব্যক্তির কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু অন্য ব্যক্তির কর্ম্ম করা অনাবশ্যক নহে। তুমি তাদৃশ জ্ঞানী নহ, এবং মূঢ়ের ন্যায় কাম্য কর্ম্মে বদ্ধ হওয়াও তোমার ন্যায় মধ্যম জ্ঞানীর উচিত নহে,

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

অতএব তুমি ফলকামনা-রহিত হইয়া সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর। আসক্তি-রহিত কর্ম্মী পরম ফল লাভ করেন।

"নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

কোন ব্যক্তি কদাচিৎ ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া তিষ্ঠিতে পারেন না। কেন না, স্বভাবের প্রভাবে সকলেই পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

১৩। এইরূপে গীতাশাস্ত্রে প্রথমতঃ আত্মার অমরত্ব উপদেশ দিয়া পরে ঈশ্বরাপর্ণ-বুদ্ধিতে, ঈশ্বরার্থে, পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য-জ্ঞানে, নিজের লাভালাভ-বুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে কর্ম্মযোগ বলিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-কর্ম্মের উপদেশকে দৃঢ় করিবার নিমিত্তে আনুষঙ্গিকরূপে সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কাজে কাজেই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সন্ধ্যা বন্দনা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি এবং পান, ভোজন, গমন, দান ইত্যাদি আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে আবার অর্জ্জুনের জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আছে; তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৪। যদিও ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে শ্রৌতাদি কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মজন্য দোষে পুরুষ লিপ্ত হন না এবং তাহাতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞান জন্মে ও সেই জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয় ইহাই স্বামী প্রভৃতির ব্যাখ্যায় প্রকাশ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাদৃশ কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় অভিপ্রেত নহে। জ্ঞান-নিষ্ঠা ও কর্ম্ম-নিষ্ঠা অধিকারী-ভেদে পৃথক্ পৃথক্। অতএব কর্ম্ম-সম্বলিত জ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই। উভয় একজনের অসম্ভব। অতএব

"গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্থ সমুচ্চয়োন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।"

অর্থাৎ "এই গীতাশাস্ত্রে লেশমাত্রও শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মের

সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় কেহ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবেন না।” ফল-কামনা-শূন্য কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে জ্ঞান-নিষ্ঠা জন্মে; কিন্তু জ্ঞান না জন্মিলে কোন প্রকার কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না।

“তস্মাদ্‌গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ
ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ।”

অর্থাৎ “কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই যে মুক্তি হয় তাহাতে যে (শ্রৌতাদি) কর্ম্মের* সহায়তা অপেক্ষা করে না, ইহাই এই গীতাশাস্ত্রের নিশ্চিত অর্থ।” পরমার্থ-তত্ত্ব-বিষয়ে কর্ম্মে মোক্ষ গীতার তাৎপর্য্য নহে; জ্ঞানে মোক্ষই তাৎপর্য্য। আর লৌকিক উদ্দেশ্য বিষয়ে অর্জ্জুনকে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে দীক্ষিত করা গীতার মুখ্য অভিপ্রায় নহে; কিন্তু যুদ্ধকর্ম্মে উৎসাহিত করাই একমাত্র লক্ষ্য।

১৫। এই শাস্ত্রে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য যত জ্ঞান পাও তাহা লাভ কর; কিন্তু ইহার এই সার উপদেশ সকল-কেই গ্রহণ করা উচিত যে, আমরা পান, ভোজন, গমন, গ্রহণ, বাণিজ্য, রাজকার্য্য, পরিবার প্রতিপালন প্রভৃতি যত প্রকার সাংসারিক কার্য্য করি তাহা যেন ভগবানের প্রিয়কার্য্য জ্ঞানে করিতে পারি এবং আত্মীয় বন্ধুগণের মৃত্যুতে শোকাভিভূত না হইয়া যেন এই পরম সত্য মনে করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করি যে, তাঁহারা যৌবনান্তে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় দেহান্তে লোকান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন ইতি।

---

* ৭ সংখ্যক বক্তৃতার ১৪ ক্রম দেখ।

নমস্কার ও স্তোত্র।

সংখ্যা ১৬

নমস্কার।

১

হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে পূর্ব্ব দিকে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাৎদিকে নমস্কার, তোমাকে সর্ব্বদিকেই নমস্কার। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি সর্ব্ব ভূতের কারণ এবং সকলের ঈশ্বর; তোমাকে ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও অমরগণ নমস্কার করেন, আমরাও তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

২

হে সর্ব্বদেবেশ! হে দেবদেব! হে মহাদেব! আমরা তোমাকে সমস্ত জীবের গতি ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া জানি; হে দেব! তোমা হইতেই এ সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি সুর, অসুর ও মানুষ এই লোকত্রয়ের অজেয়; তুমি ব্যাপনশীল হইয়া বিষ্ণুনামে, মঙ্গলস্বরূপ হইয়া শিবনামে পরিচিত হও; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি আমাদের নেত্রের আলোক ও সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের শক্তিদাতা, তুমি সকলের বিধাতা; তোমাকে নমস্কার।

৩

হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূত-মহেশ্বর! তুমি সকলের অধিপতি, বিশ্বের কল্যাণ-ভূমি, লোক-কারণের কারণ, প্রকৃতি-

পুরুষাতীত, শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতর এবং সংহার-কর্ত্তা; আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৪

হে বিশ্বেশ্বর! অনন্ত স্বর্গ তোমার অসীম ক্ষমতার এক-বিন্দু পরিচয়মাত্র। ধন-ধান্য-পূর্ণা এই ধরণী তোমার বিকশিত পুষ্পকাননের একটি কলিকামাত্র। জ্বলন্ত সূর্য্য তোমার জ্ঞানজ্যোতির এক কণা স্ফুলিঙ্গমাত্র এবং আকাশ তোমার শক্তি-সিন্ধুর জলরাশিতে একটি বুদ্বুদবিশেষ। হে প্রভো! তোমার অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য আমারদিগের নিকটে তমোময় অবগুণ্ঠনে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অজ্ঞান বিনাশ কর; আমরা তোমাকে দেখিয়া নমস্কার করি।

সংখ্যা ১৭

স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! তুমি সৎ ও অসৎ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলের শাসনকর্ত্তা। হে অনন্তদেব! তুমি আদিপুরুষ এবং আমারদের আত্মার অন্তরাত্মা। তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি বিশ্বজ্ঞাতা, যে কোন বেদ্য ও অবেদ্য বস্তু তুমি সে সমুদয়ের জ্ঞাতা। তুমি পরমধাম বিষ্ণুপদ এবং তোমাকর্ত্তৃক এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বায়ু, মৃত্যু, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ও দিবাপতির তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ও শক্তিদাতা। তোমা হইতে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বপ্রাণী স্ব স্ব শক্তি লাভ করিয়াছে। তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরিমিত পরাক্রম; তুমি জগতের অন্তর্ব্বাহ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে অনুপমপ্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর। অতএব ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই। তুমি জগতের চক্ষুস্বরূপ, তুমি সমস্ত আত্মার পরমাত্মা, তুমি ভূত-নিচয়ের উৎপত্তি-স্থান, এবং তুমিই সমুদয় ক্রিয়ানিষ্ঠগণের আচার-প্রেরয়িতা। তুমি অখিলজ্ঞানীদিগের গতি, তুমিই যোগীগণের পরম আশ্রয়, তুমি মোক্ষাভিলাষীদিগের অনাবৃত মুক্তিদ্বার এবং তুমিই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাক। তোমা হইতে সমস্ত লোক প্রকাশ পায়। তোমা হইতে এই জগৎ শুদ্ধতা লাভ করে এবং তুমিই এই সমস্ত জগৎকে

অকপট ভাবে পালন করিয়া থাক। ঋষিগণ তোমাকে অর্চ্চনা করেন, এবং বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব শাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাকালে তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। সিদ্ধ, চারণ ও সন্ন্যাসীগণ তোমার প্রেমসুধা লাভার্থ সর্ব্বদা ব্যাকুল রহিয়াছেন। সমস্ত জ্যোতিঃ তোমাতে অবস্থান করে, তুমি সমস্ত জ্যোতির পতি। সত্য, সত্ত্ব ও অখিল সাত্ত্বিক ভাব তোমাতেই বিদ্যমান আছে। তোমারই অক্ষয় নিয়মে বদ্ধ হইয়া ভানু গ্রীষ্মকালে স্বীয় রশ্মি দ্বারা সমুদয় দেহী, ওষধি ও বনস্পতিগণের রস ও তেজ আকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে পুনর্ব্বার মোচন করেন। তোমারই অক্ষয় নিয়মের বশীভূত হইয়া সূর্য্যরশ্মি বর্ষাকালে মেঘোৎপন্ন করিয়া তৃষিত ধরাকে সুশীতল করে। তুমি শীত ঋতুতে শীতবাতার্ত্ত জীবগণের সুখকর উত্তাপ-সম্ভোগের বিধান-কর্ত্তা। তোমার অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলজনক নিয়মে শীতকালে পশুদিগের দেহে রোম বৃদ্ধি পায় এবং মানব নানাবিধ বস্ত্র নির্ম্মাণ করত শীত নিবারণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া তোমার অর্চ্চন বন্দন করেন, তাঁহাদিগের আধি ব্যাধি ও অন্য কোন আপৎ থাকে না। যাঁহারা তোমার ভাবে ভক্ত, তাঁহারা সমস্ত রোগ ও পাপ হইতে মুক্ত, সুখী ও অমর হয়েন।

সংখ্যা ১৮

স্তব।

হে পরমাত্মন্! আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য! অনন্ত তোমার মহিমা! আমরা তোমার সৃষ্টির দুরবগাহ্য গম্ভীর ভাব আলোচনা করিতে গিয়া পরাস্ত হই। তুমিই এই আশ্চর্য্য-রচিত ব্রহ্মাণ্ডের জনক, তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-পরিপূর্ণ এই অনন্ত সৃষ্টিকার্য্যের গূঢ়-কারণ-স্বরূপ, এবং তুমি এই সৃষ্টির অন্তর-বাহ্যে বিরাজ করত ইহাকে পালন ও আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি মেঘের মধ্যে থাকিয়া বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্র উৎপন্ন করিতেছ। তুমি চন্দ্রমণ্ডলের অধিদেবতা হইয়া চন্দ্রমার মনোহর জ্যোতিঃ ও সুধা বিকীরণ করিতেছ। তুমি উজ্জ্বল বলবন্ত সাগর-বক্ষে থাকিয়া তাহার ঘোরঘটা ঘোষণা করিতেছ। তুমি পর্ব্বতের অধিদেবতা হইয়া গম্ভীর-স্তব্ধানন্দ বিতরণ করিতেছ। তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি বসন্তে শোভা, পুষ্পে গন্ধ, জলে শৈত্য, পাবকে দাহিকা-শক্তি, অন্নে পুষ্টিকারিতা, বীজে তৈল, ফলে ফুলে মধু, ইন্দ্রিয়ে চেতনা, হৃদয়ে প্রেম, প্রাণে জীবন, মনে চিন্তা এবং আত্মাতে জ্ঞানধর্ম্ম পরিবেষণ করিয়া এই মর্ত্ত্য ভুবনকে পরম শোভাকর করিয়াছ। যে সকল মানব ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছেন, তুমি তাঁহারদের আনন্দ-নিকেতন—তুমি তাঁহারদের পরমান্ন-

স্বরূপ—তুমি তাঁহারদের শিরোভূষণ—তুমি তাঁহারদের পরম গতি ও চরম সম্পৎ। তুমি দেব, ঋষি, মুনি, মানব, দানব ও রক্ষকুলের এবং অপর সর্ব্ব জীবের তৃপ্তির অক্ষয়-প্রস্রবণ; তুমি আমারদের লোকান্তরগত পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রগণের পরমপূজনীয় দেবতা। লোকান্তরগত মহাত্মাগণের মধ্যে তোমার পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। তুমি আমারদের আবহমান কালের কুলদেবতা। তুমি আমারদের শুভকর্ম্মে বিঘ্নবিনাশন, তুমি যাত্রাকালে সিদ্ধিদাতা, তুমি বিবাহে প্রজাপতি, মৃত্যুকালে তারক-ব্রহ্ম, তুমি উৎসবে যজ্ঞেস্বর; তুমি আদিত্যে চন্দ্র, নক্ষত্র, অনিল, অনল সকলের প্রাণস্বরূপ। তুমি আমাদের দেহের ও আয়ুর ও সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ। তুমি গৃহমধ্যে মাতা পিতাস্বরূপ, ভাণ্ডারে রাজলক্ষ্মী, রাজ্যমধ্যে মহারাজা; তুমি মাতা পিতার জনক জননী, মহারাজদিগের অধীশ্বর; তুমি জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, ক্ষমাস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। যখন সকলে নিদ্রা যায়—যখন কেহ আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না তখন তুমিই সকলকে রক্ষা করিয়া থাক। আমারদের ক্ষুধা দেখিয়া তুমি ব্যস্ত হইয়া অন্ন ব্যঞ্জন দান কর, তৃষ্ণার সময় তুমি জল দিয়া থাক, আমারদের গ্রীষ্ম হইলে তুমি বায়ু বৃষ্টি প্রেরণ কর, তুমি হেমন্তে আমারদিগকে আচ্ছাদন ও উত্তাপ দান করিয়া সুখী কর। তুমি নিদ্রাকালে শান্তিদেবী, জাগরণে জ্বলন্ত-অনলোপম জাগ্রত ঈশ্বর, তুমি কুলবধূতে সতীত্ব, সাধব্য ও লজ্জা বিধান করিয়া থাক। তুমি পুণ্যাত্মার অভয়-বর-দাতা, এবং পাপীর সম্মুখে উদ্যত-বজ্রস্বরূপ। আমরা তোমার পুত্র, আমরা তোমার দাস, আমরা

তোমার প্রজা, আমরা তোমার অন্তেবাসী এবং তুমি আমার-দের পিতা, প্রভু, রাজা ও গুরু। তোমার মহিমা, তোমার করুণা, তোমার প্রেম কীর্ত্তন করিয়া কে শেষ করিতে পারে? তোমার শক্তি, তোমার পবিত্রতা, তোমার জ্ঞান কে ধারণ করিতে পারে? সাগর যদি শুষ্ক হয়, সূর্য্য যদি নির্ব্বাণ হয়, পৃথিবী যদি চূর্ণ হয় তথাপি তোমার শক্তি ও করুণার অন্ত হইবেক না ইতি।

সংখ্যা ১৯

নমস্কার।

১

হে ভুবনেশ্বর! তুমি সকল জগতের মহত্তত্ত্বস্বরূপ, সকল ব্রহ্মাণ্ডের শোভাস্বরূপ, সকল বিশ্বের আনন্দস্বরূপ, সকল তত্ত্বের জ্ঞানস্বরূপ, নিখিল ভুবনের প্রাণস্বরূপ, ত্রাণস্বরূপ ও তৃপ্তিস্বরূপ। তুমি সকল বিচারের সিদ্ধান্তস্বরূপ, সকল চিন্তার লক্ষ্যস্বরূপ, সকল ভাবের রসস্বরূপ, সকল অভিলাষের প্রেমস্বরূপ এবং সকল কারণের মূল কারণ; তোমাকে নমস্কার।

২

উন্নত-শেখর-শোভিত ভূধরে তুমি মহত্ত্ব ও শোভা সম্পাদন করিয়াছ। তাহার প্রস্তরসমূহে তুমি কাঠিন্য ও নেত্র-প্রীতিকর ও পরমশোভাকর শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানাবর্ণ প্রদান করিয়াছ। তুমি গিরিসমূহের উপরিভাগ হইতে মধুর-জলবিশিষ্টা স্রোতস্বিনীগণকে লোকালয়ে প্রেরণ করিয়া জন-সমাজের নানা উপকার করিতেছ; তোমাকে নমস্কার।

৩

তুমি সমুদ্রকে সুবিস্তীর্ণ ও অগাধ-সলিল-পূর্ণ করিয়াছ, তুমি রুদ্রভাবে তাহার নীলোজ্জ্বল বক্ষে উত্তাল তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত ও ত্রাসিত করিয়া থাক, তুমি তাহার জলরাশিকে লবণাক্ত করিয়া ভূলোকের অশেষ কল্যাণ

বিধান করিতেছ এবং তুমি তাহাতে অনন্তভাব প্রদান করিয়া আপনার ধ্রুব অনন্তভাব সপ্রমাণ করিতেছ। সাগর-জলকে তুমি অসংখ্য জীবের আবাস-স্থান করিয়া তথায় তাহাদের প্রতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষ্য ভোজ্য বিধান করিতেছ। তুমি যেমন পর্ব্বতে জাগ্রত, সেইরূপ সাগরেও জাগ্রত; তোমাকে নমস্কার।

৪

তুমি মর্ত্ত্যপুরে অশেষ কল্যাণ দ্বারা জীবগণকে সুখে রাখিয়াছ। এমত স্থান নাই, এমত বৃক্ষপত্র নাই, এমত পুষ্পদল নাই, এমত এক বিন্দু বারি নাই যাহাকে তুমি কোটি কোটি জীবের আবাস্য না করিয়াছ। এমত জীব নাই যাহাকে তুমি জীবন-ধারণ-জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা না দিয়াছ, এবং যাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শান্তির সুখকর উপায় করিয়া না রাখিয়াছ। তুমি যেমন ভূধর সাগরের অধিদেবতা, সেইরূপ সর্ব্বজীবের অধি-দেবতা; তোমাকে নমস্কার।

৫

তুমি এই ধরণীকে কত শোভায় শোভিত করিয়াছ। কত ধন ধান্য রত্নরাজিতে পূর্ণ করিয়াছ। তোমার প্রস্ফুটিত বিচিত্রবর্ণ সুরভি কুসুমদাম যুগপৎ নয়ন ও নাসিকাকে তৃপ্ত করিতেছে, মধুপকুলের মত্ততা উৎপন্ন করিয়া নরলোকে ভারে ভারে মধু প্রদান করিতেছে। বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত কীট পতঙ্গ বিহঙ্গ সকল একদিকে অঙ্গশোভা দ্বারা মানবের নেত্র-প্রীতিকর হইতেছে, অন্যদিকে মধুর স্বরে সকলকে মোহিত করিতেছে। তুমি প্রত্যেক বৃক্ষে, প্রত্যেক পুষ্পে, প্রত্যেক বনে ও পতঙ্গ বিহঙ্গগণের ক্রীড়ায় বিরাজ করিতেছ; তোমাকে অগণ্য নমস্কার।

৬

তুমি মানবের প্রত্যেক অঙ্গ এক এক সুখের দ্বারস্বরূপ করিয়াছ এবং মানবের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত সুখের যোগ রাখিয়াছ। তুমি দর্শনের সুখ—শোভা ও মহত্ত্ব; শ্রবণের সুখ—সঙ্গীত ও বাদ্য; স্পর্শের সুখ—শৈত্য, উষ্ণতা ও কোমলতা; রসনার সুখ—আস্বাদ; এবং নাসিকার সুখ—গন্ধ প্রদান করিয়াছ। জীবন-ধারণার্থে আহার ও পান; কিন্তু পান ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে রসনা যে সুখানুভব করে তাহা আনন্দজনক উৎসাহস্বরূপ। হে সর্ব্বসুখের উৎসাহ-দাতা! তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

৭

তুমি যেমন পর্ব্বত, সাগর, ধরণী ও জীবদেহকে শোভাময় ও সুখযুক্ত করিয়াছ এবং আপনি সেই সর্ব্বত্রেই জাগ্রত আছ; সেইরূপ মানবের আত্মাকে নানা শক্তি দ্বারা ও নানা শোভা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছ এবং সেখানেও স্বয়ং বিরাজমান আছ। তুমি সকল জগতে আছ; কিন্তু জগৎ তোমাকে জানে না, কেবল মনুষ্যকেই তোমাকে জানিবার অধিকার দিয়াছ। মনুষ্য তোমার রচিত বিশ্বভুবনে ও তোমার সুনির্ম্মিত আত্মপুরে তোমাকে দর্শন করিতেছেন। তুমি যেমন বিশ্বভুবনের প্রাণ, সেইরূপ আমাদেরও আত্মার প্রাণস্বরূপ; তোমাকে বার বার নমস্কার।

৮

হে দেব! তোমাকে পর্ব্বতে নমস্কার, সাগরে নমস্কার, ধরাধামে নমস্কার, সূর্য্যমণ্ডলে নমস্কার, জীবদেহে নমস্কার, আমারদের প্রত্যেক অঙ্গে নমস্কার এবং আত্মপুরে নমস্কার

করি। তোমাকে দেবলোকে নমস্কার, তারকামণ্ডলে নমস্কার, অন্তরীক্ষে নমস্কার; তোমাকে নির্জ্জন দেশে নমস্কার, জনতাপূর্ণ নগরে নমস্কার; তোমাকে রাজদ্বারে নমস্কার; তোমাকে দেবালয়ে নমস্কার, তীর্থস্থানে নমস্কার; তোমাকে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে নমস্কার; তোমাকে বহুল-ব্যস্ততা-পূর্ণ বাণিজ্যে, শস্যক্ষেত্রে, নদীতীরে ও রাজপথে নমস্কার; তোমাকে গৃহমধ্যে নমস্কার, পিতামাতার স্নেহমধ্যে নমস্কার, বালক-বালিকার সহাস্য বদনে নমস্কার; তোমাকে প্রত্যেক সাধুর মুখকমলে নমস্কার করি। হে কৃপানিধান! তুমি পাপীর গতি, দুর্ব্বলের বল, অন্ধের যষ্টি; তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি ইতি।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	৪	আদ্যঃ	অদ্যং
২৭	১৪	স্থিবন্ধানাং	স্থিতিবন্ধানাং
৪৫	১৬	ভারতীর	ভারতীয়
৫০	১৯ । ২০	করিতেগন	করিতেন
৫৫	৪	স্রষ্টা	দ্রষ্টা
৫৯	২০	ব্রাহ্মতে	ব্রহ্মেতে
৯৫	৬	পূর্ণ্যতীর্থ	পুন্যতীর্থ
১১০	২২	প্রতিপালক	প্রতিপাদক
১১৬	৬	নিষ্কল	নিষ্ফল
১৩১	৫	সুনিয়মিত	নিয়মিত
১৬৮	১৬	কিন্তু সেই	কিন্তু যিনি সেই